প্রথম অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবীর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্য জীবন

প্রথম অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবীর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্য জীবন

অনন্তকাল ধরে নিরন্তর গতিতে বয়ে চলেছে সময়। প্রতিনিয়ত যে সমস্ত ঘটনা আমাদের চারপাশে ঘটে চলেছে, তা কালের স্রোতে প্রবাহিত মহাকালের মোহনায় গিয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কালের এই বিচিত্র গতিতেই এগিয়ে চলে তারিখ, মাস, সাল ও শতাব্দী। এই স্রোতে ভেসে আসা সমস্ত মুহূর্তগুলো বুদ্‌বুদের মতো ঢেউয়ের বুকে মিলিয়ে গেলেও কিছু মুহূর্ত যেন মহামুহূর্ত হয়ে রয়ে যায় মুক্তো বহনকারী ঝিনুকের মতো। এমনই একটি তাৎপর্যমণ্ডিত মহামুহূর্ত হল ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২৪শে পৌষের শুক্রবারের একটি সকাল। কোন বিশেষ ঘটনা মুহূর্তকে স্মরণীয় করে তোলে, কিন্তু তা শুভ ও অশুভ দুইই হতে পারে। মহামুহূর্ত বা শুভক্ষণ কিন্তু মঙ্গলজনক দিকটিই সূচিত করে। তাই সেই শুক্রবারের শুভক্ষণের সকালটি ইংরাজি ১৯০৯ সালের ৮ই জানুয়ারি — বর্তমান যুগের অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভাময়ী ক্ষণজন্মা আশাপূর্ণা দেবীর জন্মলগ্নটি চিহ্নিত করছে। আশাপূর্ণা দেবীর জন্মলগ্ন অত্যন্ত শুভযোগসূচক ছিল বলে অনেকেরই ধারণা। তিনি জন্মান উত্তর কোলকাতার পটলডাঙ্গাতে, তাঁর মাতুলালয়ে।

আশাপূর্ণা দেবীর আয়ুষ্কাল ৮৬ বছর ৬ মাস ৫ দিন। এই জীবন প্রবাহের দিকে ফিরে তাকালে তাঁর জীবনকে মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় —

আশাপূর্ণা দেবীর জীবন পর্যায়

জন্ম ঃ ০৮ / ০১ / ১৯০৯ মৃত্যু ঃ ১৩ / ০৭ / ১৯৯৫
২৪ / ০৯ / ১৩১৫ ২৭ / ০৩ / ১৪০২

প্রাক্ বিবাহ জীবন বা ছেলেবেলা	বিবাহিত ও একান্নবর্তী সংসার জীবন	আমৃত্যু একান্ত নিজস্ব সংসার জীবন
০৮/০১/১৯০৯ → ২২/০৭/১৯২৪	২২/০৭/১৯২৪ → ১৯৬০	১৯৬০ → ১৩/০৭/১৯৯৫
২৪/০৯/১৩১৫ → ০৬/০৪/১৩৩১	০৬/০৪/১৩৩১ → ১৩৬৭	১৩৬৭ → ২৭/০৩/১৪০২

সাহিত্যের অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিতা আশাপূর্ণা দেবীর ব্যক্তি জীবন আর সাহিত্য জীবন মিলেমিশে এক হলেও এখানে যতটা সম্ভব তাঁর ব্যক্তি জীবনকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

আশাপূর্ণা দেবীর পিতা ছিলেন শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও মাতা ছিলেন শ্রীমতী সরলাসুন্দরী দেবী। তাঁরা ছিলেন উত্তর কোলকাতার বৃন্দাবন বসু লেনের বৃহৎ গুপ্ত পরিবারের মেজ ছেলে ও মেজ বৌ। হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত তখনকার বিখ্যাত সি. ল্যাজারাস কোম্পানীতে ডিজাইনার বা নকশা আঁকার কাজ করতেন, কারণ তিনি ছিলেন অঙ্কনবিদ্যায় পারদর্শী। গুপ্ত পরিবারের আদি পিতৃনিবাস ছিল হুগলী জেলার বেগমপুরে। বর্তমানে পৈতৃক ভিটার সঙ্গে বৎসরে একবার কালীপুজোয় যোগাযোগ রক্ষিত হয় মাত্র।

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন সুদক্ষ শিল্পী। সেই সূত্রে কোম্পানীর কর্তা ব্যক্তিদের অত্যন্ত নিকটজন হয়ে ওঠেন এবং সকলের কাছে আস্থাভাজনও করে তোলেন নিজেকে। এই কর্ম ও চারিত্রিক গুণাবলীর জন্যই তিনি ধীরে ধীরে কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং সেই আনুকূল্যেই তিনি নিজস্ব সংসার রচনা করবার ক্ষমতা অর্জন করেন। কোম্পানীর সাহেবদের সহায়তায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে (খান্না সিনেমা হলের পাশে), তৎকালীন আপার সার্কুলার রোডের একটি বাড়িতে যৌথ পরিবার থেকে সরে গিয়ে একান্ত নিজস্ব — স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে সংসার পাতেন। এখানেই আশাপূর্ণা দেবীর জীবনের প্রথম পর্যায়ের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও সরলাসুন্দরী দেবী আলাদা সংসার পাতলেও পারিবারিক ঐতিহ্যকে ও রীতিনীতিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে চলতেন। কারণ যে বাড়িতে এ যাবৎ নিজেকে তৈরি করেছেন সেই বাড়ির ধারাকে সমীহ করে চলাতেই তিনি বা তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন। আশাপূর্ণা দেবীর পিতামহী সংসারকে একটি সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

আশাপূর্ণা দেবীর ছেলেবেলা বলতে যে চেহারার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা হল — একমাথা ঝাঁকড়া চুল ধুলি-ধূসরিত অবস্থায়, পা দুটোও তথৈবচ। সারা গা ধুলো-ঘামে মাখামাখি, হাত দুটো অজস্র খেলার উপকরণে বোঝাই — তাই ঘাম মোছবারও সময় নেই। খালি দেশলাইয়ের বাক্স, সাবানের খোল, সিগারেটের খালি টিন, কাঠের টুকরো নিয়ে একতলায় ও ছাদে অসংখ্য বার যাতায়াত। একটু বড় হবার পরে সরঞ্জাম বদলে সেখানে ঠাঁই নিয়েছে হাতুড়ি, কাটারি, পেরেক, সরু-মোটা তার, বিস্কুটের টিনের পাতলা শিট। আর তার ফলে হাতে পায়ে নানাস্থানে সর্বদা ব্যাণ্ডেজ বাঁধাই থাকতো। সেই থেকে সেই মেয়ের নাম হয়ে গেল 'দস্যি', 'পাহাড়ে', 'ডাকাত'। এই ধরনের খেলার-ধারা বলে বিশাল 'তুতো' সাম্রাজ্যের মধ্যে বাস করেও কোন সাথী পেতেন না খেলতে গিয়ে। এই দস্যি মেয়েকে নিয়ে মা গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে তাকে বসিয়ে দিয়েছিলেন একটা উঁচু জানালার চওড়া ধাপে, আর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন একটা বই। এই শিশুর হাতে বই ধরিয়ে দেবার পেছনে তৎকালীন সময়েও মায়ের একটা প্রগতিশীল মানসিকতা ধরা পড়ে। এভাবেই আশাপূর্ণা দেবীর হাতে উঠে এল প্রথম বই।

বই পড়তে শেখাটাও তাঁর ক্ষেত্রে একটু অভিনব ছিল। তিনি নিজেই এ বিষয়ে সুন্দরভাবে বলে গেছেন। তাঁর দুই দাদা মেঝেতে মাদুর পেতে বসে বইয়ের ওপর ঝুঁকে একবার লেখাটা দেখে নিতেন একবার পড়ুয়াদের মুখটা। যেন উচ্চারিত শব্দগুলোকে লেখ্য শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছেন। শেষে দেখা গেল, তিনি যখন পড়ছেন বইয়ের উল্টো দিক দেখে। বই সোজা করে ধরলেই আর পড়তে পারছেন না। সম্পূর্ণ লেখাটা তার সামনে ছবির মতো অখণ্ডচিত্র হয়ে ধরা পড়ত, বর্ণ বা বর্ণমালা ছিল অচেনা জগত। এই উল্টো পড়া নিয়ে বাড়িতে সকলের মধ্যে হাসির ধুম পড়ে যেত। বাড়িতে কোন নতুন অতিথি বা আত্মীয়-স্বজন এলেই সেই মেয়েটির ডাক পড়ত, এবং উল্টো করে বই পড়ে শোনাতে হত। দস্যিপনা চরিত্রের সঙ্গে উল্টো করে বই পড়াটা মিলেমিশে একটা উদ্ভট চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

আশাপূর্ণা দেবীর ছেলেবেলার জীবনে তাদের বাড়ির পাশের 'গুহ'দের কালীবাড়ির ঘণ্টাধ্বনি ভীষণভাবে তাঁকে নাড়া দেয়; এই ঘণ্টা ধ্বনির শব্দই তাঁকে স্মৃতির সমুদ্রে অবগাহন করিয়ে আনে যেন। তাঁদের বাড়ি যে কতটা শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চলত তা বোঝা যায় — এই কালীবাড়িতে যখন সন্ধ্যাবেলায় ঘণ্টা বাজানো শুরু হত, তখন গুপ্ত বাড়ির ছেলে-মেয়েরা (ছোটরা) যে যেখানেই খেলাধুলা করুক না কেন সকলেই হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে চোখ বুজে বসে পড়বে, যতক্ষণ না ঘণ্টাধ্বনি ও সন্ধ্যা আরতি শেষ হয়। এ থেকেই বোঝা যায় তাঁদের বাড়ির একটা সুশৃঙ্খল নিয়ম ছিল। আশাপূর্ণা দেবীর জীবন পর্যায়ের প্রথম পর্ব চলছে এই অংশগুলোতে। পাঁচ বছর বয়সে তিনি মা ও ভাই-বোনেদের সঙ্গে রাঁচিতে ছোটমামার বাড়িতে যান। আশাপূর্ণা দেবীর ছোটমামা ছিলেন রাঁচির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চুনীলাল রায়। সেখানে থাকাকালীন তাঁর একটি ভাই জন্মাল। পরীক্ষা থাকায় তাঁদের সঙ্গে দুই দাদা আসতে পারেন নি, পরীক্ষা মিটলে তাঁর দুই দাদাও রাঁচিতে চলে আসেন। রাঁচিতে সর্বমোট কয়েক মাস কাটিয়ে সকলে মিলে কোলকাতায় ফিরে আসেন। এবারে পুরনো বাড়িতে আর ফিরে গেলেন না। ১৬৬ নং আপার সার্কুলার রোডের নতুন ভাড়া বাড়িতে উঠে আসেন। এই অংশ থেকে শুরু হয় প্রথম পর্যায়ের দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বই তাঁকে নানাভাবে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল।

আশাপূর্ণা দেবীরা ছিলেন নয় ভাই-বোন। যথাক্রমে — স্নেহলতা, বীরেন্দ্রনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ, রত্নমালা, আশাপূর্ণা, সম্পূর্ণা, হীরেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও লেখা। এই পাঁচ বোন ও চার ভাই বহুমুখী পারিপার্শ্বিক নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছিলেন। আশাপূর্ণা দেবীর মা সরলাসুন্দরীও ছিলেন শিক্ষানুরাগী, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ও সুরুচি সংস্কৃতি সম্পন্ন পরিবারের কন্যা। তাঁর সাত ভাইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যিনি তিনি ছিলেন লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক অমৃতলাল রায় ও সর্ব কনিষ্ঠের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আশাপূর্ণা দেবীর মেজমামার

ছেলে জ্যোতির্ময় রায় ছিলেন রাঁচির কাছে 'কাঁকে'র হাসপাতালের বড় ডাক্তার।

আশাপূর্ণা দেবী তাঁর মা-বাবা সম্পর্কেও নানা ধরনের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, তাঁরা বড় হয়ে উঠেছেন এক ধরনের পরস্পর বিরোধী আবহাওয়ার মধ্যে, যেমন, তাঁর বাবা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন ভীষণভাবে রাজভক্ত, অর্থাৎ ইংরেজীপ্রীতি আর মা সরলাসুন্দরী দেবী ছিলেন প্রচণ্ড রাজবিদ্বেষী, অর্থাৎ মনেপ্রাণে স্বদেশী। তাঁর নিজের কথাতেই কিছুটা পরিচয় দেওয়া যাক — "মার জীবনে একটি মাত্রই পরমার্থ, সেটি হচ্ছে সাহিত্য। আর বাবার ওই 'সাহিত্য' জিনিসটি বাদে, একশোরকম পরমার্থ! কতরকম হবিই যে ছিল বাবার! তাসখেলা, পাশাখেলা, মাছধরা, কালীপুজোয় বাজি বানানো, ফানুস তৈরি করে আকাশে ওড়ানো, গোবর গুহর জ্যাঠামশাই 'অম্বু গুহর কুস্তির আখড়ায়' কুস্তি শিখতে যাওয়া, ভোরবেলায় উঠে ডাম্বেল ভাঁজা, আবার তার সঙ্গে ঘর সাজানো এবং নিজেকে সাজানো।" *(পৃ. ৩৫ আর এক আশাপূর্ণা)*। তাঁর বাবার পোষাকের ব্যবহারেও যে শৌখিনতা প্রকাশ পেত, তাতেও যেন শিল্পী মনস্কতা ফুটে উঠতে দেখা যায়। তিনি পরতেন — ফুল কোঁচানো মিহি ধুতি, গিলে কোঁচানো মিহি আদ্দির পাঞ্জাবী, ছুরি কোঁচানো মিহি উড়ুনি, আর নিজের হাতে পালিশ করা জুতো। তিনি নিজের হাতে নিজের বাড়ির সমস্ত কাঠের আসবাবপত্র পালিশ করতেন। তাঁর নিজস্ব একটা কার্পেন্টারি বাক্সও ছিল, যেখানে থাকতো ছোটখাটো নানান যন্ত্রপাতি এবং যা দিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর অতি সূক্ষ্ম সব কাঠের জিনিস বানাতেন। আর ছবি আঁকা তো নেশা থেকে পেশায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তখনকার দিনের বিখ্যাত সি. ল্যাজারাস কোম্পানীর ডিজাইনার হিসেবে তিনি বাইরেও কাজ করতে যেতেন। যেমন — বরোদা, ইন্দোর, পাতিয়ালা এবং সবচেয়ে বেশী যেতেন কুচবিহারে। কারণ কুচবিহারের রাজাদের শিল্পচর্চায় বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি জীবিকার প্রয়োজনে কমার্শিয়াল আর্ট করলেও অন্যান্য ছবির দিকেও তাঁর ঝোঁক ছিল। যেমন — তিনি পোট্রেটও আঁকতেন, আবার সেগুলো বিক্রিও হয়ে যেত। এইরকম একজন বহুমুখী প্রতিভাধর, শিল্পী এবং শিল্পরসিক ব্যক্তি ছিলেন আশাপূর্ণা দেবীর পিতা।

তখনকার দিনে যৌথ পরিবারের একজন মহিলা বা গৃহবধূ, শুধুমাত্র বই পড়ার সুবিধার জন্য শ্বশুরবাড়ির নিন্দা-মন্দ সহ্য করে আলাদা একটা বাড়িতে চলে আসা — এ আশ্চর্য ব্যাপার নয় কি? অথচ, আশাপূর্ণা দেবীর মা সরলাসুন্দরী দেবী মনের সাধ মিটিয়ে সাহিত্যের আঙিনায় বিচরণ করতে পারবেন বলে তাই করেছিলেন। এই হলেন আশাপূর্ণা দেবীর মা। একান্নবর্তী পরিবারে সরলাসুন্দরীকে সকলেই ভালোবাসত, কিন্তু ঘরের বউ যদি সময়-সুযোগ পেলে সংসারের অন্য কাজে হাত না লাগিয়ে শুধু বইয়ে নিমজ্জিত হয়ে থাকতে চায়, তবে পরিবারের গুরুজনেরা সেটা সহ্য করবেন না, তাই স্বাভাবিক। বলতে গেলে ঝগড়াঝাঁটি নয়, শুধু এই কারণেই হরেন্দ্রনাথ ও সরলাসুন্দরীর আপার সার্কুলার রোডের একটি বাড়িতে তাঁদের নিজস্ব সংসার তৈরি হয়। সেই বাড়িতে রাম বলে একটি

ছেলে আশাপূর্ণা দেবীর ছোট্ট ভাইটিকে সামলাতো এবং একজন গিন্নিবান্নি বামুনদি রান্নাঘর সামলাতেন। কারণ, হাঁড়ি-কুড়ি সামলাতে গেলে শখ মিটিয়ে বই পড়তে পারতেন না — এই কথাটা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। আশাপূর্ণা দেবীর বাবার সাহিত্য প্রীতি না থাকলেও স্ত্রীর সাহিত্য প্রীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে তাঁর অবদান অপরিসীম। উনি নিজে তদারক করে বাড়িতে প্রচুর বই আনাতেন। হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত যখন গভর্ণমেন্ট আর্টস স্কুলের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন, তখন থেকেই বাড়িতে অনেক পত্র-পত্রিকা আসত। যেমন — 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'অর্চনা', 'মালঞ্চ', 'নারায়ণ', 'সবুজপত্র', 'সাধনা', 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতী', বেশ বড় মাপের লাল মলাটের 'বালক' ও ছোট্ট মাপের 'শিশু' নামে একটি পত্রিকা। এর বেশ কিছু সময় পরে আসতে শুরু করে 'সন্দেশ', 'মাসিক বসুমতী', ও 'বিচিত্রা'। এছাড়া আসতো বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের যাবতীয় গ্রন্থরাজি, 'জ্ঞানবিকাশ লাইব্রেরী', 'চৈতন্য লাইব্রেরী' এবং 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' লাইব্রেরীর নানাবিধ গ্রন্থসমূহ। পুরানো পত্র-পত্রিকা বাঁধানো অবস্থায় একমাত্র 'সাহিত্য পরিষদ' এ পাওয়া যেত বলে ওখান থেকে 'প্রবাসী', 'ভারতী', 'প্রদীপ', 'সখা ও সাথী', 'মুকুল' এবং এমনই নানাধরনের পত্র-পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে প্রতিটি সংখ্যাই আসত। গল্প-উপন্যাস ছাড়াও ছাপার অক্ষরে যা প্রকাশিত হত, তার প্রায় প্রতিটি লেখাই এই বাড়িতে এসে পৌঁছাত। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ — এদের তো কথাই নেই, এমনকি কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পর্যন্ত সরলাসুন্দরী দেবীর সংগ্রহে ছিল। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার মলাট আশাপূর্ণা দেবীর বাবা এঁকে দিয়েছিলেন বলে এই পত্রিকাটির প্রতিটি সংখ্যা সৌজন্য সংখ্যা হিসেবেই তাঁরা পেতেন, পয়সা দিয়ে গ্রাহক হতে হয়নি। সন্তানদের মানুষ করা, সংসার দেখার পাশাপাশি একজন গৃহিণীর পক্ষে এত বই পড়া অবশ্যই আশ্চর্যের বিষয়। এতেই বোঝা যায় সরলাসুন্দরী দেবীর সাহিত্য প্রীতি কতটা গভীর। তিনি একথাও মানতেন যে, বড়দের বই পড়লেও ছোটরা কখনো খারাপ হয় না। কারণ, জ্ঞান অবধি বই পড়তে থাকলে বই পড়ে খারাপ হবার বদলে নানাবিধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই অর্জন করে থাকে। এইরকম একজন যথার্থ শিল্পী এবং শিল্পী মনের মানুষ ছিলেন আশাপূর্ণা দেবীর বাবা এবং প্রকৃত সাহিত্য রসপিপাসু ছিলেন তাঁর মা।

বাংলা সাহিত্য মানেই রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃষ্টি দ্বারা সমৃদ্ধ এবং বাঙালী মাত্রেই রবীন্দ্রানুরাগী, আশাপূর্ণা দেবীও এই পরিমণ্ডলের বাইরে নন। তিনিও মনেপ্রাণে রবীন্দ্রনাথকে অসীম শ্রদ্ধা করতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অনুরাগীদের স্বহস্তে চিঠির উত্তর দিতেন বলে আশাপূর্ণা দেবী শুনেছিলেন। সেই আশায় ভর করে অনেকদিনের সাধ পূরণ করতে তিনি ও তাঁর ছোটবোন সম্পূর্ণা একদিন অনেক কষ্টে খাম, কাগজ ও রবীন্দ্রনাথের ঠিকানা জোগাড় করে চিঠি লিখে ফেললেন। একে চিঠি না বলে আবেদনই বলা চলে। "নিজের হাতে আমাদের নাম লিখে একটি উত্তর দেবেন।" *(পৃ. ৩৭*

আর এক আশাপূর্ণা) — এই মর্মে গোপনে চিঠি পাঠিয়ে কম্পিত বক্ষে উভয়ে দিন গুণতে থাকেন। দিন কয়েক পরে এল সেই আকাঙ্ক্ষিত উত্তর। শক্তপোক্ত সাদা কাগজের বড় মাপের একখানি খামে করে চিঠি এল। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন এভাবে — "আমরা কি বেঁচে আছি? আমরা কি জেগে আছি?" *(পৃ. ৩৮ — ঐ)*। তাঁর মা সরলাসুন্দরী দেবীরও ছিল অসীম রবীন্দ্র প্রীতি। মেয়েদের এই কাজে আপ্লুত হয়ে বললেন — "তোরা পারলি? আমি শুধু স্বপ্নই দেখেছি।" *(পৃ. ৩৮ — ঐ)*। নিজের চেষ্টায় সংগৃহীত এই রাজ ঐশ্বর্য লাভ করেই আশাপূর্ণা দেবীর মন অর্ধেক দৃঢ় হয়ে উঠল। তাই তিনি বললেন — "জলেই জল বাড়ে। দুঃসাহসেই দুঃসাহস বাড়ে।" *(পৃ. ৩৮ — ঐ)*। এর পরপরই তিনি তাঁর প্রথম কবিতা 'বাইরের ডাক' ১৩২৯ বঙ্গাব্দে 'শিশুসাথী' পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন।

আশাপূর্ণা দেবী যে পরিবারে জন্মেছেন, খোদ কোলকাতা হলেও সে পরিবারে মেয়েদের পড়াশোনার কোন বালাই ছিল না। তাঁর পিতামহী ছিলেন কঠোর এবং দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী, একান্নবর্তী পরিবারের রক্ষণশীলতাকে মেয়েদের ওপর কিভাবে আরোপ করতে হয়, তা তিনি খুব ভালো জানতেন। মেয়েরা স্কুলে বা পাঠশালায় গিয়ে তো পড়বেই না, এমনকি কোন গৃহশিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীও তাদের পড়াতে পারবেন না। লেখাপড়া শিখলেই মেয়েরা বাচাল হয়ে উঠবে — এই কথাটি অত্যন্ত যুক্তিহীন বুঝতে পেরেও আশাপূর্ণা দেবীর বাবা কাকাদের তাঁদের মায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কোন ক্ষমতা ছিল না। এত নিষেধ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র মায়ের উৎসাহে তাঁর পড়াশোনার কোন অসুবিধা হয়নি। আশাপূর্ণা দেবীর মায়ের বই পড়ার জন্য কি পরিমাণ বই তাঁদের বাড়িতে আসত, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে; এই বিপুল সংখ্যক বইয়ের রাশির মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী ও তাঁর দিদি-বোনেদের জীবন শুরু হয়। তিনি শুধু পাঠাভ্যাসের মধ্যেই নিজেকে নিমজ্জিত রাখেন নি, অন্যান্য অনুভূতির জগতও তাঁর মনকে জাগ্রত করে রাখত। যেমন, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের জগতের মধ্যে শব্দটাই আশাপূর্ণা দেবীকে বেশী আকর্ষণ করত। তাঁর মনে হত শব্দময়ী কোলকাতার নারী যেন নানা বিচিত্র শব্দের তরঙ্গে ও সংঘাতে সর্বদাই চঞ্চলা হয়ে থাকেন। ছেলেবেলার কথায় নানাবিধ শব্দের বৈচিত্র্য তাঁকে নাড়া দিত। প্রথমেই যে শব্দটি তাঁকে স্মৃতির মোহময় জগতে নিয়ে যেত, তা হচ্ছে কলের বাঁশীর শব্দ। ভোরবেলা থেকেই তাঁদের উত্তর কোলকাতার আশে পাশের ধানকল, তেলকল থেকে শব্দ নির্গত হতে শুরু করত। যেমন — 'সাড়ে পাঁচটার ভোঁ', 'সাড়ে আটটার ভোঁ', 'বারোটার ভোঁ', 'পাঁচটার ভোঁ'। তাঁর কাছে যেটা মহিমান্বিত শব্দ বলে মনে হত তা হচ্ছে কেল্লার তোপ দাগার শব্দ। আর এক শব্দময় জগত তাঁর কাছে অপার বিস্ময় আর ভালোলাগা নিয়ে। জঞ্জাল ফেলার রেলগাড়ির ঝিক্ ঝিক্ শব্দ আর তাঁর প্রাণ উদাস করা 'কুউ উ' ধ্বনি। এই রেলগাড়ি ময়লায় বোঝাই করা হত। সারা শহরের ময়লা আবার সংগৃহীত

হত আর এক শব্দে। রাত চারটে থেকে শুরু হত হাড় পাঁজরা বের হওয়া ঘোড়ায় টানা ময়লা গাড়ির 'ঝড়াং ঝড়াং' শব্দ। ঘোড়ায় টানা গাড়িগুলোর ময়লা একত্রিত হয়ে রেলগাড়ি বোঝাই হয়ে ভরদুপুরের নির্জন নিথর অনুভূতিকে উদাসী জগতের দিকে টেনে নিয়ে যেত 'কু' ধ্বনিতে। রেলগাড়ির বোঝার ক্ষমতাও ছিল না — একটি কচি প্রাণ উদাসী শব্দটার জন্য মনে মনে অপেক্ষা করে থাকত।

শব্দ স্মৃতির আরো একটা শব্দ হল পথচারীকে সচেতন বা সাবধান করে দেবার শব্দ। ঘোড়ার গাড়ির চালকরা যারা গাড়োয়ান বা কোচোয়ান নামে পরিচিত, তারা 'রোক্‌খে রোক্‌খে' বলে হাঁক পাড়ত। সেটা যেন 'রক্ষে রক্ষে' বলে আশাপূর্ণা দেবীর কানে বাজত। বড়লোকের শৌখিন জুড়ি গাড়ি চলত — 'রোক্‌খে' ধ্বনির সঙ্গে 'ঠুং-ঠুং' ঘণ্টা ধ্বনি করে। দুপুরের নির্জনতার প্রাচীর ভেদ করে বাসনওয়ালার 'ঠং-ঠং' বাসন বাজানোর আওয়াজ। পর পর এক এক করে ফেরিওয়ালারা হাঁক পাড়তে পাড়তে যেত — 'চীনের সিঁদুর, খেলনা ... কাঁচের চুড়ি', 'ট্যাপারি, টোপাকুল, নারকুলে কু—ল।' *(ঐ, পৃ. ৪৭)* 'পাংখা বরফ' হাঁক পৌঁছে যেত ছোটদের কানে। দুপুর রোদের তীব্রতা কিঞ্চিৎ কমে আসার মুখেই শোনা যেত রাস্তায় জল দেবার শব্দ। এই সমস্ত শব্দগুলো এতটাই সময় বেঁধে হত যে, গৃহস্থরা ঘরে বসেই আন্দাজ করতে পারতেন সময়ের পারদ কোথায় গিয়ে চড়েছে। সন্ধ্যের প্রাক্কালে শোনা যেত 'কুলপী — বরো — ফ!' *(ঐ, পৃ. ৪৭)* ঐ মধুর ধ্বনি যেন লেখিকা জীবনের প্রান্তে এসেও শুনতে পেতেন, কুলপীর হাঁক যেন শ্যামের বাঁশরীর মতো ঘর থেকে টেনে বের করে আনত বারান্দায়। একটা পয়সা কোনভাবে হাতে আসা মানেই কুলপী এসে যাওয়া, এই আনন্দটাই মাতিয়ে রাখত।

সন্ধ্যের আগে আগেই রাস্তার গ্যাস বাতি জ্বালানেওয়ালারা মই ঘাড়ে করে বেরত, আর রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বালিয়ে দিয়ে যেত। যখন আঁধার নেমে আসত ছোটদের কাছে একটা ভয়ের আবেশ নিয়ে, তখন প্রায়শঃই এসে হাজির হতো 'মুস্কিল-আসান'। যেই না 'মুস্কিল-আসান' এই শব্দটি আশাপূর্ণা দেবী এবং তাঁর ভাইবোনেদের কানে যেত, ভয়ে তাদের ভয়ানক হৃদ্‌কম্প হত এবং হৃৎপিণ্ড ঠাণ্ডা হবারও উপক্রম হত। ঐ শব্দ কানে যাওয়া মাত্রই চোখের সামনে ভেসে উঠতো টকটকে লাল আলখাল্লা ও স্ফটিকের মালাধারী দাড়ি ও বড় বড় চুলওয়ালা মশাল হাতে ভয়ানক সেই মূর্তি। 'ইঁয়াপি মুস্কিল-আসান, যাঁহাস মুস্কিল তাঁহাস আসান' — *(ঐ, পৃ. ৪৯)* এই ভয়ংকর চেহারা মশাল হাতে যখন সাঁঝের আলোয় জলদগম্ভীর সুরে হাঁক দিয়ে এসে দাঁড়াত তখন বাড়ির ছোটদের হৃৎপিণ্ড কাঁপবারও ক্ষমতা যেন হারিয়ে ফেলত। তবুও একটি করে পয়সা হাতে নিয়ে সকল ভাইবোনে মিলে 'মুস্কিল-আসান' এর কাছে দাঁড়াত ভুষোকালির টিপ পরার জন্য, যাতে পাপ না হয়।

সন্ধ্যের পরেও ফেরিওয়ালার হাঁকের বিরাম ছিল না। রাতের নিথর পথকে চিরে বেরত

সেইসব হাঁক। 'কুলপী বরোফ —' 'বেলফুল' ... 'তপসে মাছ'। এই শব্দগুলো যে একটি অনুভূতিপ্রবণ শিশুকে নাড়া দিয়ে যেত, তা কোন শব্দের উৎসস্থলের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না।

আশাপূর্ণা দেবী ছোটবেলার কথা বলতে গিয়ে নিজের জীবনের আরো অনেক দিকের কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর মা-বাবা পরস্পরবিরোধী মতবাদের হলেও বাড়িতে নানা উৎসব অনুষ্ঠানে সকলে সুন্দরভাবে মেতে উঠতেন। যেমন — বড়দিন, কালীপূজা ও আরো নানা কিছু। ওঁরা ছোটবেলায় এই উৎসব অনুষ্ঠানগুলো বেশ উপভোগ করতেন, সঙ্গে ওঁদের বাবা-মাও যোগ দিতেন। বাবা-মা-ই তাঁদের এসব অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা শেখাতেন। দেওয়ালী, কালীপুজো, বড়দিন, শ্রীপঞ্চমী, রথযাত্রা, অরন্ধন, নবান্ন, পৌষপার্বণ ইত্যাদি বেশ আনন্দমুখর হয়ে উঠত।

'রথযাত্রা' উৎসবে একটা তিনতলা কাঠের রথ এনে আশাপূর্ণা দেবীর বাবা-মা তাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে সাজিয়ে, মাঝে একটি জগন্নাথ বসিয়ে ষোড়শোপচারে সাজাতেন এবং রান্নাঘরের ছাদটুকুর মধ্যেই তাকে নিয়ে টানাটানি চলত। 'দীপাবলী'তে হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রায় চার / পাঁচশ মাটির প্রদীপ মুটের মাথায় চাপিয়ে নিয়ে হাজির হতেন, আর সরলাসুন্দরী দেবী তার জন্য তেল ও প্রায় হাজার খানেক সলতে পাকাতে মহোৎসাহে বসে যেতেন। ছাদের আলসে, ঘর-বারান্দা, জানালা-দরজা, বাড়ির বাইরের রক সবকিছুই আলোর মালায় আলোকিত করে তুলতেন। কালীপুজোর আগে আগে তাঁদের বাড়িতে এসে যেত সোরা, গন্ধক, কাঠকয়লা, লোহাচুর প্রভৃতি সব কাঁচামাল। এ সমস্ত দিয়ে তুবড়ি তৈরি হত। শিল-নোড়া, হামান দিস্তা দিয়ে সরলাসুন্দরী দেবী সমস্ত জিনিস সুন্দরভাবে গুঁড়ো করতেন, ন্যাকড়া দিয়ে গন্ধক, কাঠকয়লা ছাঁকতেন — এরপর বারুদ ও অন্যান্য চূর্ণ দিয়ে নানা মাপের সব তুবড়ি ঠাসা হত। পরিবারের সকলে মিলে এইভাবে এইসব ব্যাপারগুলো উপভোগ করতেন। এইসব তুবড়ি আবার দেশের বাড়ির যে কালীপুজো সেখানেও যেত। কালীপূজা উপলক্ষে বড় বড় ফানুস বানিয়ে আকাশে ওড়ানোও ছিল হরেন্দ্রনাথ গুপ্তের আর একটি শখ। ঘুড়ির কাগজের মতো গোছা গোছা নানা রঙের কাগজ আসত বাড়িতে। লম্বা-বৃহৎ সাইজের লম্বাটে লাউয়ের মতো একটা গড়ন তৈরি করা হত কাগজ কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে জুড়ে। ফানুসটার সরু মুখের দিকে শক্ত করে তার দিয়ে বেঁধে কেরোসিনের ভেজানো ছেঁড়া কাপড়ের টাইট একটি বল-এ আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হত। তার আবার নির্দিষ্ট মাপ রয়েছে। আশাপূর্ণা দেবীর মা সেই কাজটি বেশ দক্ষতার সঙ্গে করতেন। সারা দুপুর ধরে বসে সরু সরু পরিষ্কার ছেঁড়া কাপড়ের ফালিগুলো নিয়ে আঁটোসাঁটো করে জড়িয়ে জড়িয়ে সেই ফানুসের বল তৈরি করে তুলতেন। তারপর তা কেরোসিনে ভেজানো হত। বলটি এমনভাবে ভিজত, যেন তেল চপচপেও নয় আবার ভেজাও হয়। কার্তিক মাসে বাড়িতে আকাশ প্রদীপ দেওয়াও একটা সুন্দর শিল্পের চর্চা বলে মনে করা হত। পাড়ার সমস্ত বাড়ির থেকে

223083 31 MAR 2010 LIBRARY NBU

উঁচু একটা বাঁশে রঙীন কাগজে আঁটা চীনে লণ্ঠনে প্রদীপ বসিয়ে বাঁশে কপিকলের সাহায্যে উঁচুতে তুলে দেওয়া হত। প্রতি সন্ধ্যায় এই কাজটি করা সরলাসুন্দরী দেবীর খুব প্রিয় ছিল।

২৫শে ডিসেম্বর, 'বড়দিন'টাকে আশাপূর্ণা দেবীদের বাড়িতে খুব সুচারুভাবে উদ্‌যাপন করা হত। তাঁর মা-ও শিল্পীমনস্কা ছিলেন, তাই প্রতিটি জিনিসকে, উৎসবকে শিল্পসুষমায় প্রস্ফুটিত করে তুলতে তিনি ভালোবাসতেন। হরেন্দ্রনাথ ও সরলাসুন্দরী দেবী 'বড়দিন' কেও তাই স্বমহিমায় সাজিয়ে তুলতেন। যেমন — বড়দিনের দুদিন আগে থেকে পাতলা রঙীন কাগজ, কাঁচি, ময়দার আঠা দিয়ে সরলাসুন্দরী দেবী কাগজের শিকল বানাতে শুরু করে দিতেন। সারা বাড়িতে, ছাদের আলসেতে সেগুলো ঝোলানো হত। বিদ্যুৎ না থাকায় 'টুনি' বাল্ব দেবার সুযোগ ছিল না, তাই তাঁর মা সারা বছর ধরে সিগারেটের টিনগুলো জমাতেন ও তাঁর বাবা সেগুলো ফুটো করিয়ে আনতেন। এই টিনগুলোর ভেতরে প্রদীপ বসিয়ে সেগুলো ঝুলিয়ে দেওয়া হত। শুধু এই দিনটির জন্য সারা বছর ধরে সিগারেটের টিনগুলো জমানো হত।

বাড়িতে কোন আত্মীয়-স্বজন এলে বড়দিনের উৎসব দেখার জন্য আশাপূর্ণা দেবীরা সকলে ঘোড়ার গাড়ি করে সাহেব পাড়ার 'বড়দিন' দেখতে যেতেন। গাড়িতে 'গুড়ের-নাগরী' ঠাসবার মত ঠাসা হয়ে যেত সকলে, তথাপি উৎসব দেখতে হত খড়খড়ি দেওয়া জানালা দিয়ে। দরজা বা জানালা কিছুই খোলা যাবে না, কারণ সাহেবরা রয়েছেন বাইরে। এতটাই রক্ষণশীলতার মধ্য দিয়ে বাইরের জগতে চলতে হত তাঁদের।

'বড়দিন' মানেই বাড়িতে আসত ঝুড়ি ভর্তি কমলালেবু চ্যাঙারি ভর্তি নতুন গুড়ের সন্দেশ ও হৃষ্টপুষ্ট একখানি কেক। কেকখানি হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত অফিস পাড়া থেকে আগেরদিনই নিয়ে আসতেন, কিন্তু সকলেরই জানা সত্ত্বেও কেক আনবার ব্যাপারটাকে যেন অজানা রাখার ভান করা হত। এই উপলক্ষে আরও বিশেষ খাবার-দাবার আসত, যেমন — 'হান্টলী পামার' এর এক টিন বিস্কুট ও ঠোঙা ঠোঙা মেওয়া ফল। বড়দিনের বিস্কুটের এই ছিল আনন্দ উদ্রেককারী একটি বিষয়। কোন্ ভাই বা বোন বিস্কুটের টিনটি সেইবারের মতো পাবেন তা আগে থেকেই ঠিক করা থাকত। এই বিস্কুটের টিনের ফিনফিনে টিনের কভারটি টিনের ভেতরেরই পাতলা ছুরির মতনটি দিয়ে এমন সুন্দরভাবে ধীরে ধীরে কাটতেন যে, এই কাটার মধ্য দিয়েও হরেন্দ্রনাথের শিল্প সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়ে উঠত। এছাড়া আরো একটি মজার ব্যাপারও উল্লিখিত হল — খুব মিহি কাগজের প্যাকেট বানিয়ে তার মধ্যে নানা রকমারি লজেন্স-জেম বিস্কুট ভরে নিতেন আশাপূর্ণা দেবীর বাবা। লজেন্স-বিস্কুটগুলো নানা ধরনের জীব-জন্তুর মুখের আকৃতির মত হত। সেই ঠোঙা উঁচুতে তুলে আছাড় মারতেন আর সমস্ত বিস্কুট-লজেন্সগুলো যেন হরির লুঠের বাতাসার মত ছড়িয়ে পড়ত চারধারে। আশাপূর্ণা দেবীর সমস্ত ভাই-বোনেরা এমনকি বাড়ির কাজের লোকেরা পর্যন্ত এই আনন্দমেলায় সামিল হতেন। বাড়ির

ছোটদের প্রতি অবশ্য নির্দেশ ছিল গরুর মুখাবয়ব বিশিষ্ট লজেন্স-বিস্কুটগুলো যেন না খাওয়া হয়। বড়দিনের খাবারের ভাগ বাড়ির কাজের লোকেরা এবং ধোবা, গয়লা, জমাদার পর্যন্ত পেত। ঠাকুর-চাকর-ঝি সকলকে এইদিনে লেবু, সন্দেশ, মেওয়া, পাটালীসহ গায়ের চাদর বা কম্বল দেওয়া হত। আর, এইদিনে বাইরের কোন লোককে সবসময়ই খেতে বলা হত।

আশাপূর্ণা দেবী দুর্গাপূজা সম্পর্কেও বাড়ির এবং তাঁর ছোটবেলার অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। শরৎকাল আসতে না আসতেই ভিখারী বৈষ্ণবেরা আগমনী গানের সম্ভার নিয়ে এসে হাজির হতেন। সেই চিরকালীন গান — "যাও যাও গিরি, আনতে গৌরী — উমা কেমন করে রয়েছে!" আবার নবমীর সকালের সেই কাতর মিনতি — "নবমী নিশি গো, তুমি আর পোহায়ো না" — *(পৃ. ১০ আর এক আশাপূর্ণা)*। সেই কাঁধে কাঁথার সেলাই করা ঝুলি, গলায় কণ্ঠী, পরণে ফর্সা ধুতি, সারা শরীরে চন্দনের রেখা আর গায়ে হরেকৃষ্ণ ছাপ নামাবলী। বৈষ্ণবের মুখে আগমনী গান শুনেই যেন বিরাট বড় এক প্রাপ্তির আনন্দে মেতে উঠতেন। বাড়ির পরিবেশ সম্পর্কে যা বলেছেন তাতে জানা যায় — বাড়িতে অনেক জোড়া কোরা কাপড় আসত গাঁঠরি ভর্তি। দূর-দূরান্তে অনেক আত্মীয়-স্বজনের কাছে চলে যেত, দেশের বাড়িতে চলে যেত আশাপূর্ণা দেবীর ঠাকুমার জন্যে বেশ কিছু এবং বাকিগুলো চেনাজানা বাইরের কিছু লোক এসে ঠিক সময়মতো সেগুলো নিয়ে যেত। আর ধোবা, গয়লা, নাপিত, জমাদার, রাঁধুনি — এরা তো পাবেই। তাঁতিনীরা আসত পুঁটুলি বহন করে প্রচুর শাড়ীর সম্ভার নিয়ে। সেই গাটরির সকলের ওপরে থাকত — 'ফুল পাড়', 'কল্কা পাড়', 'মতি পাড়', 'ধাক্কা পাড়', 'চুড়ি পাড়' ও 'জরি পাড়', নানা ধরনের ছোট ছোট সব ধুতি। তারপর আসত বাড়ির মেয়েদের জন্য শাড়ী। সেগুলো হচ্ছে — 'লীলাম্বরী', 'কালাপানি', 'চাঁদের আলো', 'বউ পাগলা', 'সরু ডুরে', 'চ্যাটালো ডুরে', 'চৌখুপি ডুরে', 'গঙ্গা যমুনা ডুরে' — ইত্যাদি সব নাম। আর সকলের শেষে হাত পড়ত দশহাতি শাড়ীতে, বাড়ির গিন্নীদের জন্য। তাতেও থাকত নানা রকমারি — 'কাশী পাড়', 'রেললাইন পাড়', 'সিঁতেয়সিঁদুর পাড়', 'কল্কা পাড়', 'তাবিজ পাড়', 'আনারস পাড়', 'গঙ্গাযমুনা পাড়', 'এলোকেশী', 'বন্দেমাতরং পাড়' — ইত্যাদি। নানা রকমারি শাড়ীর বাহার মেলে ধরতেন সেই 'গিরি তাঁতিনী'।

পুজো উপলক্ষে আর একজন বাড়িতে আসতেন, তিনি হচ্ছেন দক্ষ নাপতিনী। পুজোর কদিন রোজ এসে তারা বৌদিদিদের, খুকিদের চরণ ধরে টানাটানি করত। খুকিরা নতুন জুতোয় ছাপ লাগবে বলে আলতা পরতে চাইত না, আর জবরদস্তি পায়ে ধরে টানতে থাকত। আশাপূর্ণা দেবীর বাবা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন জুতোর ব্যাপারে ভীষণ শৌখিন, তাই সব ভাইবোনদের জন্য পুজোয় আসত নতুন জুতো। তিনি এ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা হল — "সে এক মহোৎসব। সেই বাক্সদের বুকে রাখি, না, মাথায় রাখি, না, মাথার বালিশের পাশে রেখে নিশিযাপন করি" — *(ঐ পৃ. ৫৫)*।

বাড়ির পুরুষরা ও মেয়েরা আলাদা আলাদা হয়ে দলবদ্ধভাবে অনেক দূরে দূরে পায়ে হেঁটে ঠাকুর দেখে ঘুরে ফিরে বাড়ি ফিরত সব। বিভিন্ন পুজো মণ্ডপের সামনে নানা খাবারের রকমারি দোকান আর নাগরদোলা সহ মেলা বসে যেত, এই মেলা ছিল পুজোর একটা বিশেষ অঙ্গ। অথচ পিতৃ আদেশ লঙ্ঘন করে রাস্তার তেলেভাজা-ফুলুরি খেতে বা নাগরদোলায় চড়তে কারো সাহস হত না। পুজোর পর ছিল বিজয়া দশমী। পুজোর এই শেষ পর্বটি ছিল তাঁদের কাছে বেশ হার্দিক। প্রতিটি বাড়িতে খাবার তৈরির ধুম পড়ে যেত, আর তার সঙ্গে ছিল আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে বিজয়া করতে যাওয়া। সন্ধ্যা নেমে আসবার আগে থেকেই বাড়ি ভর্তি হতে শুরু করত লোকজনে আর তাদের মনে করা হত ভগবানতুল্য। ক্রমাগত খাবারের রেকাবী ভর্তি করা হচ্ছে নানা রসনা সুখকর খাদ্যদ্রব্যে আর সাথে সাথে সকলের হাতে দেওয়া হচ্ছে বিজয়া উপলক্ষে বানানো এক চামচ সিদ্ধির শরবত। প্রায় সারা বছর ধরেই এই যে নানা উৎসব অনুষ্ঠান চলত, আর চলত শিল্প মাধুর্য সহযোগে সেগুলোকে পালন করা। এই সমস্ত উৎসব মুখর দিনগুলো এবং তাদের জন্য আয়োজন পর্ব আশাপূর্ণা দেবীকে নানাভাবে প্রভাবিত করত। এই প্রভাব তাঁর মধ্যে ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ঘটাতে এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ করে তুলতে সাহায্য করেছিল।

এই সমস্ত অভিজ্ঞতা আশাপূর্ণা দেবী সংগ্রহ করেছেন সারা ছেলেবেলাটি ধরে। তার পরবর্তী পর্যায়ে আশাপূর্ণা দেবীরা ১৬৬ নং আপার সার্কুলার রোডের ভাড়া বাড়িতে উঠে এসেছিলেন। তাঁর জীবনের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্যায় চলছে তখন, সে সময় তাঁর বয়স পাঁচ। এই বাড়িতে আসেন হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সরলাসুন্দরী দেবী ও তাঁদের তিন ছেলে ও তিন মেয়ে। সবচেয়ে বড়দিদি স্নেহলতার তখন কার্শিয়াঙে বিয়ে হয়ে গেছে। তিনি বলেছেন — "যে বাড়িতে এসেই আমি আর দিদি সোজা ছাদে উঠে গিয়েই চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, এ বাড়ির আকাশটা কি নীল।" *(ঐ - পৃ. ৬)*। এটা যেন তাঁদের কাছে ছিল একটা আবিষ্কার। তিন বোনে যেন মুক্তির আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। আশাপূর্ণা দেবী নিজেই তিনবোনকে (রত্নমালা, আশাপূর্ণা, সম্পূর্ণা) ট্রিলজির অখণ্ড সংস্করণ বলে মনে করতেন। এ বাড়ি তাদের কাছে, বিশেষতঃ আশাপূর্ণা দেবীর কাছে আরও নানা কারণে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। যেমন — বাড়ির সামনের বড় রাস্তাকে তাঁর মনে হত — "চলমান জীবনের নিরন্তর প্রবাহ"। সেই পথ দিয়ে ঠেলায় করে জালা ভর্তি জল যেত, মহরমের তাজিয়া ভাসান যেত, আর ঘোড়ার গাড়ি চড়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে, গ্যাসের বাতি জ্বালিয়ে যেত নতুন বর; যা নাকি শিশুচিত্তকে অতি সহজেই মোহাবিষ্ট করে তুলতে পারত।

তিন বোনে একমন, একপ্রাণ হলেও খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভিন্ন রুচি বহন করে চলতেন তাঁরা। তাঁর দিদি রত্নমালা মত্ত থাকতেন পুতুল খেলায়, তিনি নিজে বাইরের ঘরে দাদাদের সঙ্গে ক্যারাম খেলা ও দস্যিবৃত্তি করেই বেড়াতেন। আর ছোট বোন সম্পূর্ণা তাঁর বাবার দেওয়া রং, তুলি ও

কাগজ নিয়ে ছবি আঁকতে বসে যেতেন। আশাপূর্ণা দেবীর মা সরলাসুন্দরী দেবী মেয়েদের মধ্যে 'পদ্য' মুখস্থ করবারও একটা নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তিন বোনের মধ্যে বিশেষ করে দুই বোনে, তিনি এবং সম্পূর্ণা কবিতা আওড়াতে আওড়াতে সারা বাড়ির লোকেদের কান একেবারে ঝালাপালা করে দিতেন। এর পর পরই আবার তাঁদের বাড়ি বদল ঘটল। এবার তাঁরা বছরখানেক অন্য পাড়ায় থেকে আবার পুরানো পাড়ায় আগের বাড়ির কাছেই উঠে এলেন। সেই বাড়ির ঠিকানা হল ১৫৭ / ১ - আপার সার্কুলার রোড, যা নাকি শেষ পর্যন্ত তাঁর বাবার বাড়ি ছিল।

এরপরই শুরু হয় আশাপূর্ণা দেবীর জীবনের দ্বিতীয় পর্ব। এবারে বাল্য ও কৈশোর কাল কাটিয়ে তিনি বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করলেন। ১৩৩১ বঙ্গাব্দ (ইং ১৯২৫) ৬ই শ্রাবণ, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর মাঝের পাড়া নিবাসী নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও সরোজিনী দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র কালিদাস গুপ্তের সঙ্গে আশাপূর্ণা দেবী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এর মধ্যেই চলতে থাকে তাঁর সাহিত্য চর্চা। তিনি যে কোলকাতাকে জানালায় বসে দেখতে ও ভালোবাসতে শিখেছিলেন, তাঁর সেই প্রিয় কোলকাতা ছেড়ে তাঁকে যেতে হল বেশ দূরে, তাঁর শ্বশুর বাড়িতে। কোলকাতা ছেড়ে যাবার ব্যথা তাঁকে বেশ বিরহী করে তুলেছিল। তাঁর স্বামী ছিলেন ব্যাংক কর্মী এবং তাঁর কর্মস্থল ছিল কোলকাতায়। তাই সারা সপ্তাহ কোলকাতায় কাটিয়ে কালিদাস গুপ্তকে সপ্তাহান্তে ছুটে আসতে হত বাড়িতে। এই টানাপোড়েন বেশিদিন চলতে পারে না, তাই কালিদাস গুপ্ত নিশ্চিন্তে কাজ করার জন্য সকলকে নিয়ে বিয়ের দু'বছরের মধ্যে কোলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে চলে আসেন। আশাপূর্ণা দেবীর শাশুড়ি, শ্বশুর, স্বামী ও দুই দেবর — সকলে মিলে সংসার পাতেন ভবানীপুরে। তাঁর শ্বশুর বাড়িতে বছরে একবার তাঁদের ইষ্টদেবী 'অন্নপূর্ণা'র পূজা হত। কৃষ্ণনগর ছেড়ে চলে এলেও এই পূজা উপলক্ষে পরিবারের সকলে একত্রিত হতেন। কিন্তু সরোজিনী দেবীর কনিষ্ঠ পুত্রের অকাল মৃত্যুর পর একসময় সে যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ধীরে ধীরে পুজোও বন্ধ হয়ে যায়।

এভাবেই এগিয়ে যেতে থাকে আশাপূর্ণা দেবীর সাংসারিক জীবন। ইতিমধ্যে আশাপূর্ণা দেবী ও কালিদাস গুপ্তের পর পর তিনটি সন্তান জন্ম নেয়। প্রথম সন্তান — কন্যা পুষ্পরেণু ও তারপর দুই পুত্র — প্রশান্ত ও সুশান্ত। তাঁদের সন্তানরাও ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, কাকা — সকলের মধ্যে সুন্দর মনের মানুষ হয়ে বেড়ে উঠছিলেন। সরোজিনী দেবীর কনিষ্ঠ পুত্রের অকাল প্রয়াণের পর দেশের বাড়ির পুজো এবং যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় ঠিকই কিন্তু কোলকাতার বাড়িতে দেবী অন্নপূর্ণার পটটি নিত্য পূজার জন্য বিরাজিত ছিল। এই ইষ্টদেবীর পটটি সরোজিনী দেবীকে দিয়েছিলেন তাঁর ভাই শ্রীশ্রী পূর্ণানন্দ স্বামী। তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী। এই পূর্ণানন্দ স্বামীর কাছ থেকেই সরোজিনী দেবী দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে দেখা যায় আশাপূর্ণা দেবী এবং কালিদাস গুপ্তও স্বামী পূর্ণানন্দর নিকটেই দীক্ষিত হন। তাঁদের ওপরে গুরুদেব অনেক অনুশাসন আরোপ করেছিলেন। তাঁরা সেই অনুশাসন

স্বরূপ নানা বিধিনিষেধগুলো পরম শ্রদ্ধায় সারা জীবনভর মান্য করে এসেছেন। সে কারণেই বেশ অল্প বয়স থেকেই প্রথমে কালিদাস গুপ্ত নিরামিষাশী হন এবং তার কিছুদিন পরে আশাপূর্ণা দেবীও সম্পূর্ণভাবে নিরামিষাশী হয়ে ওঠেন।

কর্তব্যকর্মেও তিনি ছিলেন পরম নিষ্ঠাবান। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যদের প্রতি তিনি যথাযথ কর্তব্য পালন করে গিয়েছিলেন। তাঁর শাশুড়ি ছিলেন নিয়ম-কানুন ও আচার-বিচারে অত্যন্ত কঠোর মানসিকতার মহিলা, সেই শাশুড়ির সেবা ও মনোরঞ্জন তিনি বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন। বাড়িতে পূজার্চনার ব্যবস্থা, আত্মীয়-অতিথিদের যত্ন-আত্তি ও সঙ্গে সঙ্গে সন্তান পালন — একা হাতে অসীম ধৈর্য্য ও মমতায় তিনি সামলেছেন। এভাবে যখন সংসার জীবন যাপন করছেন তখনই এক সময় আশাপূর্ণা দেবী এক শোকাহত পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ ও ১৩৫০ বঙ্গাব্দে তাঁর মাতা ও পিতার মৃত্যু ঘটে। তিনি তখন স্বামী-পুত্র-কন্যা-দেবর-জা ও তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে ভরপুর সংসারের মধ্যমণিরূপে বিরাজমান।

এরপর সন্তানদের সংসার জীবনে প্রবেশ করানোর দায়িত্ব পালন শুরু করলেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১৩৪৯) আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম সন্তান, কন্যা পুষ্পরেণুর বিবাহ সম্পন্ন হয়। বাঁকুড়া জেলার বিখ্যাত রায় পরিবারের ছেলে অতুলকৃষ্ণ রায়কে আশাপূর্ণা দেবী ও কালিদাস গুপ্ত একমাত্র জামাতা হিসেবে বরণ করেন। এরপর ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের (বঙ্গাব্দ ১৩৬০) মধ্যে পুষ্পরেণু ও অতুলকৃষ্ণের চারটি পুত্রকন্যার জন্ম হয়। আশাপূর্ণা দেবী তখন সমস্ত কর্ম, খ্যাতি সামলেও চিরাচরিত প্রথানুযায়ী ও অসীম স্নেহের সঙ্গে মাতামহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। যথাযথ দায়িত্ব কর্তব্য নিজের হাতে পরম যত্নে ও আদরে সম্পাদিত করেন।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ, বঙ্গাব্দ ১৩৫৫ — আশাপূর্ণা দেবীর জীবনে এই বছরটি চরম শোকের বার্তা বয়ে আনে। এসময়ই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রশান্ত রোগ ভোগের পর মারা যান। পুত্রশোক তাঁকে নিদারুণভাবে ব্যথিত করে তুলেছিল। তা সত্ত্বেও সমস্ত শোক-আঘাত সামলে উঠে আবার সংসার ও কর্মজগতে ফিরে গেছেন। ১৯৫৬ সালে (বঙ্গাব্দ ১৩৬২) তিনি কনিষ্ঠ পুত্র সুশান্তর বিবাহ দেন, তিনি পুত্রবধূ হিসেবে মনোনীতা করলেন শ্রীমতী নূপুর গুপ্তকে। নূপুর গুপ্ত তখন লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছে। সেই সময় থেকে স্বামী, পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে শুরু হয় আশাপূর্ণা দেবীর পথচলা।

আশাপূর্ণা দেবীর সংসার আবার স্থানান্তরিত হয় ১৯৬০ সালে (১৩৬৬ বঙ্গাব্দে)। এবারে তাঁরা আসেন গোলপার্কের গভর্ণমেন্ট হাউসিং এর ফ্ল্যাটে। তাঁর সংসারে তখন আর একজন নতুন সদস্যা যুক্ত হয়েছেন। স্বামী-পুত্র-পুত্রবধূর মাঝে তাঁর জ্যেষ্ঠা পৌত্রী শতরূপা। এর সাত বৎসর পরে ১৯৬৭ সালে তাঁর কনিষ্ঠা পৌত্রী শতদীপা জন্মায়। এবার আসে আশাপূর্ণা দেবীর জীবনের শেষ পর্যায়।

১৯৭০ সালে (১৩৭৭ বঙ্গাব্দ) গড়িয়ায় (১৭ কানুনগো পার্ক) নিজস্ব নতুন বাড়ি করে সপরিবারে বসবাস করতে শুরু করেন। অনেক জাঁকজমক করে নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশ হয়। এখানেই আমৃত্যু জীবনের বাকী বছরগুলো কাটান তিনি।

আশাপূর্ণা দেবী ব্যক্তিজীবনে নানাবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন, তার মধ্যে একটি বিশেষ গুণ ছিল আনন্দের আতিশয্যে আত্মবিস্মৃত না হওয়া ও শোকে দুঃখে বিহ্বল হয়ে না পড়া। অর্থাৎ ভালো-মন্দ কোন আবেগেই বিচলিত না হয়ে ঋজু থাকার ক্ষমতা। যেমন তিনি অনেক পুরস্কার ও সম্মানে পুরস্কৃত ও সম্মানিত হয়েছেন — অথচ আনন্দ প্রকাশের মাত্রা ছিল তাঁর বশীভূত। এমনকি ১৯৭৬ সালে লব্ধ 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার লাভের আনন্দকে আত্মীয়-বন্ধু সকলের সঙ্গে বন্টন করে নিলেও উচ্ছ্বাসের পারদ ছিল সংযত। ঠিক তেমনি ব্যাপার দেখা যেত শোক দুঃখের বেলাতেও। তিনি যখন বেশি বয়সের সীমানায় উপনীত হয়েছেন তখন খুবই সামান্য সময়ের ব্যবধানে তাঁর দুই দাদা, সর্বসময়ের সঙ্গী দিদি রত্নমালা ও কনিষ্ঠা ভগ্নী, যিনি বন্ধুর মত ছিলেন, সেই সম্পূর্ণা দেবীও মারা যান। তারও বেশ কিছুদিন পূর্বে সবচেয়ে কনিষ্ঠা যে ভগ্নী লেখা দেবী গত হন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথও। আবার কিছুকালমাত্র অসুস্থ থেকে ইহলোক ত্যাগ করেন তাঁর একমাত্র জামাতা অতুলকৃষ্ণ রায়। সেটা ছিল ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। জামাতার আগেই অকালপ্রয়াণ ঘটেছিল জ্যেষ্ঠা দৌহিত্রীর।

বিষাদ এবং হর্ষ তাঁকে যেমন একটা সংযমের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখত তেমনি জনপ্রিয়তা, খ্যাতি, সুনামও তাকে কখনো খুশীর জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যেত না। কিন্তু পাঠকদের মুগ্ধতা তাঁকে বারংবার উদ্বুদ্ধ করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে এবং তিনি নিজেও বারবার স্বীকার করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে এই পাঠকদের জন্যই তাঁর এই লিখে চলা। আনন্দঘন ও বেদনাবিধুর পরিস্থিতি আশাপূর্ণা দেবীর জীবনে আর একবার আসে প্রায় হাত ধরাধরি করে। ১৯৭৬ সালে পাওয়া 'পদ্মশ্রী' উপাধি ও একই সালে পাওয়া 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার তাঁকে আনন্দের শীর্ষদেশে উপনীত করে। আবার চরম দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটে ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসের ১২ তারিখে, তাঁর চিরসাথী, হৃদয়বান, তাঁর সমস্ত কর্মের হিতাকাঙ্খী, পরম বন্ধু, স্বামী কালিদাস গুপ্তের পরলোক গমনে। এই ঝড়কেও তিনি সামলে উঠে আবার সারস্বত সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। জীবন বিমুখ না হয়ে তিনি সমস্ত ধাক্কা সামলে আবার জীবনের কথাই বলতে লেগেছেন।

সাহিত্য আকাদেমীর ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৯৪ সালে। এরপর আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেন নি। জরাগ্রস্ততার কোলে ঢলে পড়েছেন। শারীরিক অসুস্থতা তাঁকে কলম ছাড়তে বাধ্য করেছে। বয়সোচিত কারণে অসুস্থতা দেখা দিলেও যতটা সম্ভব লেখা চালিয়েই গিয়েছেন। যখন খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন আর পারলেন না, কলমের চলার গতি রুদ্ধ হল। এই পরিস্থিতির দু'তিন

মাস পরেই এল মহাপ্রস্থানের সময়। ১৪০২ বঙ্গাব্দের ২৭শে আষাঢ় (১৯৯৫-এর ১৩ই জুলাই) ঘন বর্ষার গভীর নিশীথে ঘটল তাঁর জীবনাবসান। জীবনে পরিণত বয়সে পৌঁছে, পরিপূর্ণতা এবং পরিতৃপ্তি লাভ করেছিলেন এই মহীয়সী নারী। সহজ, সরল জীবনের ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে, নির্বিবাদে চালিয়ে গেছেন তাঁর প্রতিবাদী রচনা। একটি মহৎ প্রাণ মানুষ তাঁর উজ্জ্বল, অমলিন রচনা সাহিত্যের অঙ্গনে উপহার দিয়ে অমরলোকে চিরপ্রস্থান করলেন নিঃশব্দে গভীর রাতের নীরবতায়।

এই ব্যক্তিজীবন পরিক্রমাতেই জড়িয়ে রয়েছে আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্য জীবন; এটাই স্বাভাবিক। তাই ব্যক্তিজীবনের নানান তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাধারার উল্লেখের মধ্য দিয়ে লেখিকার মনন-দর্শনের পরিচয় তুলে ধরে এবার তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় উল্লেখযোগ্য দিকটি অর্থাৎ সাহিত্যিক আশাপূর্ণার সাহিত্য-সৃষ্টির সমগ্র দিকটির পরিচয় তাঁর জীবন প্রেক্ষাপটে প্রকাশ করার চেষ্টা করছি।

'ইচ্ছে হয়ে ছিলি মনের মাঝারে'' — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কথাতেই বোঝা যায় ভবিষ্যতের কোন প্রতিমূর্তি মনের সংগোপনে লুক্কায়িত অবস্থায় থেকে যায় ইচ্ছের রূপ নিয়ে। আর সেই ইচ্ছেটাই ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে পা ফেলে একটা পূর্ণাবয়ব ধারণ করে। আশাপূর্ণা দেবীর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। শুরুটা ঝোঁকের বশে হয়ে গেলেও ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে জন্ম নিয়েছে ইচ্ছে। এই ইচ্ছেরই বহিঃপ্রকাশ তাঁর একটি পরিণত সাহিত্যিক হয়ে ওঠার চিত্র।

প্রতিটি মানুষই পিতা-মাতা — এই দুটি ধারার সম্মিলিত নির্যাসে বুদ্ধি, কৃষ্টি, মনন ও আদর্শকে পরিপুষ্ট করে নিজেকে সমৃদ্ধ করে। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর শিল্পী পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন সূক্ষ্ম অনুভূতি, বিশ্লেষণ শক্তি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আর মাতৃ সান্নিধ্যে লাভ করেছিলেন সাহিত্য ও জীবন সম্পর্কে অদম্য এক অনুসন্ধিৎসা। এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর নিজস্ব মৌলিক প্রতিভা।

বাংলা ১৩২৯ সাল, আশাপূর্ণা দেবীর তখন তেরো বছর বয়স, সে সময় তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয়। তিনি 'শিশুসাথী' পত্রিকায় 'বাইরের ডাক' নামে একটি কবিতা পাঠান, আর তাই প্রথম মুদ্রিত রচনা তাঁর জীবনে। 'শিশুসাথী' পত্রিকার একজন কর্তা ব্যক্তি রাজকুমার চক্রবর্তীর অনুরোধ বা নির্দেশ যাই হোক না কেন, তাই আশাপূর্ণা দেবীকে ধীরে ধীরে লেখিকা হবার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। এই পত্রিকায় এরপর যত লেখাই পাঠালেন তার কোনটাই বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষিপ্ত হয়নি, বরং পত্রিকায় বেশ সুন্দরভাবে তা ফুটে উঠেছে। এই 'শিশুসাথী' পত্রিকার পরিচিতির সূত্র ধরেই অন্যান্য পত্রিকায় প্রবেশ। এভাবেই ধীরে ধীরে চলে সাহিত্যের অঙ্গনে তাঁর বিচরণ। 'শিশুসাথী'-র পাশাপাশি অন্যান্য শিশু পত্রিকা থেকেও চিঠির মাধ্যমে অনুরোধ আসে তাঁর কাছে লেখা পাঠানোর জন্য। যেমন — 'মৌচাক', 'রংমশাল', 'খোকাখুকু' ইত্যাদি সব পত্রিকা। এ প্রসঙ্গে আরো এক সম্পাদকের কথা আশাপূর্ণা দেবী বলেছেন, তিনি হলেন 'খোকাখুকু' পত্রিকার সম্পাদক নিশিকান্ত সেন। এই পত্রিকাতে একসময় একটা কবিতা

প্রতিযোগিতার কথা ঘোষণা করা হল — বিষয় ছিল 'স্নেহ'। আশাপূর্ণা দেবী সেই বিষয়ের ওপর একটি কবিতা লিখে 'স্নেহ' নাম দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর বয়স ছিল পনেরো বছরের মধ্যেই। দেখা গেল তিনিই প্রথম পুরস্কারটি পেলেন। পত্রিকায় লেখালেখির দৌলতে আশাপূর্ণা দেবীর মা সরলাসুন্দরী দেবী আহ্লাদে, গর্বে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতেন। আশাপূর্ণা দেবীর দাদা সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে নিজের জমানো পয়সায় একখানি বই কিনে পুরস্কার দিয়েছিলেন, সেটি হল — সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'অভ্র ও আবীর'। তিনি নিজে একথা ঠিকই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে, প্রায় প্রতিটি সাহিত্যিকের জীবনই শুরু হয় কবিতা ও ছোটগল্প দিয়ে।

এরপর ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে তিনি প্রথম বড়দের জন্য লিখলেন। বৃহৎ আকারে লোভনীয় মূর্তিতে হলদে মলাটের যে বইটি প্রকাশ পেল, সেটি হল শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা যে গল্পটি আনন্দবাজার পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন — তাঁর প্রকাশনার ক্ষেত্রেও তিনি আর একজনের কাছে ঋণী বিশেষভাবে। তিনি হলেন মন্মথ সান্যাল। আনন্দবাজারের 'রবিবাসরীয়' তে গল্প লিখে পাঠাবার জন্য তিনি অনুরোধ জানান এবং সেই থেকেই শুরু হল নিয়মিত পথ চলা, যার কোন বিরাম নেই বললেই চলে। ছোটগল্প ও কবিতা অর্থাৎ ছোটখাটো রচনার নানা রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুরতে ঘুরতে কলম এরপর রওনা হয়েছে বড়সড় কোন উদ্দেশ্যে। আর তা হচ্ছে তাঁর উপন্যাস রচনার লক্ষ্য। শ্রীযুক্ত বিশু মুখোপাধ্যায় ছিলেন আশাপূর্ণা দেবীর এবং তাঁর পরিবারের পরিজনদের পরিচিত বন্ধু। তিনি একসময় 'কমলা পাবলিশিং' এর পক্ষ থেকে তাঁকে অনুরোধ জানান একটা উপন্যাস লেখার জন্য। আশাপূর্ণা দেবীর নিজের ওপর বিশ্বাস ছিল না যে, তিনি উপন্যাস লিখতে পারেন, তাই প্রথমে সাহস সঞ্চার না করতে পারলেও শেষ পর্যন্ত অনেক অনুরোধ ও উপরোধে পরে লিখতে রাজী হলেন। 'প্রেম ও প্রয়োজন' নামে একখানা উপন্যাসও লিখে ফেললেন। এই হল আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম উপন্যাস, যা প্রকাশিত হয় 'কমলা পাবলিশিং' থেকে এবং সালটা ছিল ১৩৫১ বঙ্গাব্দ। পাঠক মহলে লেখাটি মোটামুটি কিছুটা সাড়াও ফেলে দিয়েছিল। এভাবেই শুরু হয় তাঁর সাহিত্যজগতে পথচলা। শুরুতে ধীর গতিতে চললেও পরে দ্রুত গতিতে তিনি একের পর এক উপন্যাস ও ছোটগল্প আরম্ভ ও শেষ করতে লাগলেন। আশাপূর্ণা দেবীর মনের ভেতরে একটা বোধ সর্বদা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত তাঁকে, আর তিনি সেটাকে চাইতেন সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। যে চিন্তা তাঁকে সর্বদা অস্থির করে তুলত, ভাবাত — তা হচ্ছে নারী জাতির প্রতি অবহেলা। সমাজে সর্বদা সমস্ত ভালো দিকগুলোর শ্রেষ্ঠাংশ শুধু পুরুষ জাতিরা পাবে অথচ নারীরা কেন নয়? ১৩৩০ বঙ্গাব্দ, আশাপূর্ণা দেবী তখন অবিবাহিতা, তিনি তখন লিখলেন একটি কবিতা। এর বিষয় ছিল দেশকে স্বর্গ আর নারীকে দেবী বলে পুরুষের বন্দনা — অথচ একে আশাপূর্ণা দেবী আত্ম প্রবঞ্চনা ছাড়া যেন আর কিছু বলে ভাবতে পারেন নি। এই কবিতাটিও একসময় 'বেতার-জগৎ' এ ছাপা হয়েছিল।

একসময় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে কবিতাটি বেতারে প্রচারিতও হয়েছিল। কবিতাটির কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল —

"— তৃপ্তি পেতেছ তুমিই কি শুধু শয্যাভাগিনী লভি?
মর্মে কর্মে সঙ্গী যে নয়, শুধু কামনার ছবি।
আসলে যে পেল দসীর আসন, 'দেবী' বলে বাড়াওনা
'সোনা' 'সোনা' বলে ফাটালে আকাশ, পিতল কি হবে সোনা?

* * *

তোমারও তো আজ ক্লান্তি এসেছে একাকী চলিতে পথ,
পশুর মতন চলিছ নীরবে, টানিয়া জীবন রথ।,
হাতে হাত রেখে চলো দুইজনে, ঘুচে যাক অবসাদ,
কর্মে আসুক নতুন প্রেরণা, নব আনন্দ স্বাদ।"

(পৃ. ১০ — আর এক আশাপূর্ণা)

মনের মধ্যে নানা ভাবের আনা গোনা চললেও তা সাহিত্য হয়ে ওঠার আগে নানা অলসতা যেন তাঁকে জড়িয়ে ছিল। একসময় আলস্যকে ছাপিয়ে ভেতরের তাগিদের সঙ্গে বাইরের তাগাদা এসে যোগ দিল। এই যোগাযোগের ফলেই জন্ম হল এক অমর সাহিত্যের। সাহিত্য মহলে যথেষ্ট প্রভাবশালী পত্রিকা 'কথাসাহিত্য' — এর পক্ষ থেকে আশাপূর্ণা দেবীর কাছে অনুরোধ আসে একটি ধারাবাহিক উপন্যাসের জন্য। এর পর পরই 'মিত্র ও ঘোষ' পাবলিশার্স থেকে শ্রীযুক্ত ভানু রায় মহাশয়েরও অনুরোধ আসে একখানি 'বড়' উপন্যাস রচনার জন্য। বাইরের জগতের এই তাগাদাগুলোই তাঁর অন্তরের ইচ্ছাটাকে প্রকট করে তুলল এবং সমস্ত আলস্য ভেদ করে বেরিয়ে এল যুগান্তকারী এক রচনা, যার নাম হল 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'। এটি হল আশাপূর্ণা দেবীর বিখ্যাত ট্রিলজির প্রথম গ্রন্থ। বইটি বাংলা ১৩৭১ সালে 'মিত্র ও ঘোষ' থেকে প্রকাশিত হয়। ১৩৭২ বঙ্গাব্দেই উপন্যাসটি 'রবীন্দ্র' পুরস্কারে ভূষিত হয়। এর কিছুদিন পরে তিনি আবার সাপ্তাহিক বসুমতী থেকে অনুরোধ পেলেন, তখন লিখতে শুরু করেন ট্রিলজির দ্বিতীয় খণ্ড 'সুবর্ণলতা' (১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দ)। এই ট্রিলজির প্রথম খণ্ডে অর্থাৎ 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' তে তিনি দেখিয়েছেন শতবর্ষ প্রাচীনকালের সমাজচিত্র। গ্রামীণ সমাজের এক বিত্তশালী ঘরের পটভূমিকায় লেখা এই গ্রন্থ। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র নায়িকা সত্যবতী এবং তারই কন্যা সুবর্ণলতাকে নিয়ে রচনা করেন ট্রিলজির দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সুবর্ণলতা'। আজ থেকে এত বছর পূর্বে যখন নারীরা শুধুমাত্র নারীই ছিল, যাদের প্রধান কাজই ছিল নারী ধর্ম পালন করা, কিন্তু মানুষ হিসেবে কথা বলার, জানার কোনরকম অধিকার তাদের ছিল না, সেই সময়ের মেয়ে ছিল সত্যবতী। যে নাকি বাবার ছত্র ছায়ায় একজন 'মানবী' হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনচেতা ও উদার মনোবৃত্তিসম্পন্ন সত্যবতীর কন্যা সুবর্ণও মাতৃ প্রদত্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে

৫। 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার — ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দ, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র জন্য।

৬। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক হরনাথ ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার স্বরূপ স্বর্ণ পদক প্রাপ্তি ১৯৮৮।

৭। শরৎ পুরস্কার — ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ।

৮। জগত্তারিণী স্বর্ণ পদক — কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত, ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দ।

এছাড়া ভারত সরকার ১৯৭৬ এ 'পদ্মশ্রী' উপাধি প্রদান করেন ও ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে 'ফেলো' নির্বাচিত করেছিল। ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডি. লিট' সম্মানে সম্মানিত করেছিল। ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডি. লিট' দেয় এবং ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় আশাপূর্ণা দেবীকে সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' প্রদান করেন এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে একই সম্মান অর্থাৎ সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' প্রদান করেন (১৯৯০)।

অন্যান্য পদ ঃ — বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের সদস্য ছিলেন তিনি। একসময় ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সদস্যের পদও অলংকৃত করেন। অসংখ্য সাহিত্য সংস্থার সঙ্গে তাঁর ছিল নিয়মিত যোগাযোগ। বহু গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য সংস্থায় তিনি সভা নেতৃত্বের দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন। বেতার ও দূরদর্শনের নানা অনুষ্ঠানেও তিনি বহু বছর অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবী আজীবন প্রচুর সাহিত্য রচনা করে গেছেন। তার মধ্যে উপন্যাস, ছোটগল্প, শিশুদের জন্য রচিত পুস্তক, কিশোরদের জন্য কিছু রচনা, এছাড়াও কিছু অগ্রন্থিত প্রবন্ধ, কিছু কবিতাও রয়েছে। তাঁর রচিত যে পুস্তক তালিকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে সেখান থেকে উপন্যাসগুলো প্রায় সমস্তটাই নীচে দেওয়া হল। এরপরও হয়ত অপ্রকাশিত বা আমার সংগ্রহের বাইরে কিছু রয়ে যেতে পারে।

১।	প্রেম ও প্রয়োজন	(১৯৪৪)	১১।	উন্মোচন	(১৯৫৭)
২।	অনির্বাণ	(১৯৪৫)	১২।	নেপথ্য নায়িকা	(১৯৫৭)
৩।	মিত্তির বাড়ি	(১৯৪৭)	১৩।	জনম জনমকে সাথী	(১৯৫৭)
৪।	বলয়গ্রাস	(১৯৪৯)	১৪।	অতিক্রান্ত	(১৯৫৭)
৫।	অগ্নিপরীক্ষা	(১৯৫২)	১৫।	ছাড়পত্র	(১৯৫৯)
৬।	যোগবিয়োগ	(১৯৫৩)	১৬।	প্রথম লগ্ন	(১৯৫৯)
৭।	নবজন্ম	(১৯৫৪)	১৭।	সমুদ্র নীল আকাশ নীল	(১৯৬০)
৮।	কল্যাণী	(১৯৫৪)	১৮।	উত্তর লিপি	(১৯৬০)
৯।	নির্জন পৃথিবী	(১৯৫৫)	১৯।	মেঘ পাহাড়	(১৯৬০)
১০।	শশীবাবুর সংসার	(১৯৫৬)	২০।	তিন ছন্দ	(১৯৬১)

উঠতে শুরু করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর থাকল না। মায়ের পথ থেকে একসময় সুবর্ণ বিচ্যুত হল, কারণ তার ঠাকুমা এলোকেশীর সিদ্ধান্তে এবং সত্যবতীর অজান্তে কলকাতা শহরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে সুবর্ণকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়। যে পরিবারে আভিজাত্য বলে কিছু নেই, রয়েছে শুধু অহংকার ও দম্ভ। এই 'সুবর্ণলতা' গ্রন্থে সেই যুগকে দেখানো হয়েছে, যেখানে নারীরা সুখের শয়নে শায়িত রয়েছেন কিন্তু সর্বাঙ্গ যেন জুড়ে রয়েছে অবমাননার মোড়কে। ট্রিলজির দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে যাবার বেশ কিছুদিন পর 'কথাসাহিত্যে'রই অনুরোধে এবং অনেকটা নিজেরও উৎসাহে আশাপূর্ণা দেবী লিখতে শুরু করেন তৃতীয় গ্রন্থ 'বকুল কথা' (১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দ)। যা নাকি কথাসাহিত্যেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'বকুল কথা'তে বকুল নায়িকা নয়, দর্শক। দর্শকের আসনে থেকে সমাজ ও জীবনকে যেমনভাবে দেখতে পাচ্ছে, তেমনভাবেই তুলে ধরছে গ্রন্থে। একটা গোটা সমাজ, প্রতিনিয়ত যার চেহারা ও রং বদলাচ্ছে, তাকে সামগ্রিকভাবে না হলেও মূল সুরকে আশাপূর্ণা দেবী 'ট্রিলজি'র মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তিনটি যুগের চিত্র যেন তিনটি প্রজন্মের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। আশাপূর্ণা দেবী সারাজীবন ধরে যে সমস্ত ভাবনাগুলো ভেবে এসেছেন এবং যে প্রশ্নগুলো সারাজীবন ধরে তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে তাই যেন ট্রিলজিতে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে।

আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম কবিতা ছিল 'বাইরের ডাক', প্রথম উপন্যাস 'প্রেম ও প্রয়োজন' (১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) আর প্রথম বই হল — 'ছোটঠাকুর্দার কাশীযাত্রা' (১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ), যার প্রথম প্রকাশ কাল হল বাংলা ১৩৪৫ সালের শ্রাবণ মাসে। এই বইটি সংকলন করে প্রকাশ করেছিল 'বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স' অর্থাৎ যেখান থেকে 'শিশুসাথী' পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। 'শিশুসাথী' পত্রিকার মাসিক ও বার্ষিক সংখ্যায় আশাপূর্ণা দেবীর যে সব গল্প প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে বাছাই করে সংকলিত হল এই 'ছোটঠাকুর্দার কাশীযাত্রা'। আরো একটি বইকে প্রথম হিসেবে ধরা যায়, তা হল — 'জল আর আগুন'। দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং থেকে প্রকাশিত, যা বড়দের জন্য গল্প সংকলন গ্রন্থ। অনেকদিন পর্যন্ত লোকজন ভাবত — আশাপূর্ণা দেবী ছদ্মনামে আসলে কোন পুরুষ লেখক লিখছেন। কারণ আশাপূর্ণা দেবী বলিষ্ঠ লেখিকা হলেও ছিলেন অন্তঃপুরচারিণী এবং অপরিচিতা।

আশাপূর্ণা দেবী অনেক পুরস্কার ও নানাবিধ সম্মান লাভ করেছেন এবং নানাবিধ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নিম্নে সেগুলি উল্লেখ করা হল ঃ—

১। লীলা পুরস্কার — কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ।

২। মতিলাল পুরস্কার — যুগান্তর পত্রিকা প্রদত্ত, ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ।

৩। ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক — কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত, ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ।

৪। রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার — পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত, ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের জন্য।

২১। মুখর রাত্রি (১৯৬১)
২২। আলোর স্বাক্ষর (১৯৬১)
২৩। দিনান্তের রং (১৯৬২)
২৪। আর এক ঝড় (১৯৬২)
২৫। নদী দিকহারা (১৯৬২)
২৬। একটি সন্ধ্যা একটি সকাল (১৯৬২)
২৭। সোনার হরিণ (১৯৬২)
২৮। জহুরী (১৯৬২)
২৯। মায়াজাল (১৯৬২)
৩০। দোলনা (১৯৬৩)
৩১। উড়োপাখি (১৯৬৩)
৩২। বহিরঙ্গ (১৯৬৩)
৩৩। জীবন স্বাদ (১৯৬৩)
৩৪। বেগবতী (১৯৬৩)
৩৫। জলছবি (১৯৬৩)
৩৬। আবহসঙ্গীত (১৯৬৪)
৩৭। উত্তরণ (১৯৬৪)
৩৮। জনতার মুখ (১৯৬৪)
৩৯। লঘু ত্রিপদী (১৯৬৪)
৪০। দু'য়ে মিলে এক (১৯৬৪)
৪১। শুক্তি সাগর (১৯৬৪)
৪২। রাণা শহরের কাণাগলি (১৯৬৪)
৪৩। প্রথম প্রতিশ্রুতি (১৯৬৪)
৪৪। যুগে যুগে প্রেম (১৯৬৫)
৪৫। সুখের চাবি (১৯৬৫)
৪৬। সুয়োরাণীর সাধ (১৯৬৫)
৪৭। সুরভি স্বপ্ন (১৯৬৫)
৪৮। বৃত্ত পথ (১৯৬৫)
৪৯। রংয়ের তাস (১৯৬৬)
৫০। যুগলবন্দী (১৯৬৬)
৫১। মায়া দর্পণ (১৯৬৬)
৫২। শেষ রায় (১৯৬৬)
৫৩। নীল পর্দা (১৯৬৬)
৫৪। দুই মেরু (১৯৬৬)
৫৫। রাতের পাখী (১৯৬৬)
৫৬। সুবর্ণলতা (১৯৬৭)
৫৭। স্বর্গ কেনা (১৯৬৭)
৫৮। নীলাঞ্জনা (১৯৬৭)
৫৯। বিম্ববতী (১৯৬৭)
৬০। বালুচরী (১৯৬৭)
৬১। সেই রাত্রি এই দিন (১৯৬৭)
৬২। সমুদ্র কন্যা (১৯৬৭)
৬৩। অন্য মাটি অন্য রং (১৯৬৭)
৬৪। অনবগুণ্ঠিতা (১৯৬৭)
৬৫। অন্তর বাহির (১৯৬৭)
৬৬। যাহা চাই তাহা (১৯৬৮)
৬৭। দুই নায়িকা (১৯৬৮)
৬৮। বিজয়ী বসন্ত (১৯৬৮)
৬৯। সময়ের স্তর (১৯৬৮)
৭০। শুধু তারা দুজনে (১৯৬৮)
৭১। জালিকাটা রোদ (১৯৬৯)
৭২। মন মর্মর (১৯৬৯)
৭৩। দ্বিতীয় অধ্যায় (১৯৬৯)
৭৪। গাছের পাতা নীল (১৯৬৯)
৭৫। দর্শকের ভূমিকায় (১৯৬৯)
৭৬। নীল বন্দর (১৯৬৯)
৭৭। বিরহী বিহঙ্গ (১৯৬৯)
৭৮। নয় ছয় (১৯৭০)

৭৯। মনের মুখ (১৯৭০)
৮০। অনিন্দিতা (১৯৭১)
৮১। নিভৃত আকাশ (১৯৭১)
৮২। মধ্যে সমুদ্র (১৯৭১)
৮৩। দূরের জানলা (১৯৭১)
৮৪। কী পাইনি (১৯৭২)
৮৫। ঝিনুকে সেই তারা (১৯৭২)
৮৬। চাঁদের জানলা (১৯৭২)
৮৭। দর্পণে ছায়া (১৯৭২)
৮৮। রাত্তির পরে (১৯৭২)
৮৯। রেল লাইন (১৯৭২)
৯০। যার যা দাম (১৯৭২)
৯১। শিকলি কাটা পাখি (১৯৭৩)
৯২। নক্সা কাটা ঘর (১৯৭৩)
৯৩। তরঙ্গহীন (১৯৭৩)
৯৪। ওরা বড়ো হয়ে গেল (১৯৭৩)
৯৫। বকুল কথা (১৯৭৪)
৯৬। ভালোবাসার মুখ (১৯৭৪)
৯৭। হারানো খাতা (১৯৭৪)
৯৮। যে যায় দর্পণে (১৯৭৫)
৯৯। কখনো দিন কখনো রাত (১৯৭৫)
১০০। হয়তো সবাই ঠিক (১৯৭৫)
১০১। হে ঈশ্বর, তোমার যবনিকা (১৯৭৫)
১০২। পলাতক সৈনিক (১৯৭৬)
১০৩। লোহার গরাদের ছায়া (১৯৭৬)
১০৪। বংশধর (১৯৭৬)
১০৫। উত্তর পুরুষ (১৯৭৬)
১০৬। সময় অসময় (১৯৭৬)
১০৭। এই যুগ এই মন (১৯৭৬)
১০৮। আবৃতা অনাবৃতা (১৯৭৭)
১০৯। পাখির খাঁচা ও খাঁচার পাখি (১৯৭৭)
১১০। চার দেওয়ালের বাইরে (১৯৭৭)
১১১। ওরা ভাঙ্গেনা (১৯৭৭)
১১২। সোনার কৌটা (১৯৭৭)
১১৩। ত্রিনয়নী (১৯৭৭)
১১৪। শূন্যতার বাসা (১৯৭৮)
১১৫। যুগান্তরে যবনিকা পারে (১৯৭৮)
১১৬। পয়সা দিয়ে কেনা (১৯৭৮)
১১৭। সুখের ঠিকানা (১৯৭৯)
১১৮। সাপের ছোবল (১৯৭৯)
১১৯। মোম জ্বলে মোম গলে (১৯৭৯)
১২০। তিন ভুবনের কাহিনী (১৯৭৯)
১২১। অবিনশ্বর (১৯৭৯)
১২২। প্রতীক্ষার বাগান (১৯৮০)
১২৩। বালির নীচে ঢেউ (১৯৮০)
১২৪। সুখের নিলয় (১৯৮০)
১২৫। এই তো সেদিন (১৯৮০)
১২৬। উনিশশো উনআশিতেও (১৯৮০)
১২৭। পুঁথির লেখা (১৯৮০)
১২৮। অহল্যা উদ্ধার (১৯৮১)
১২৯। সূর্যোদয় (১৯৮১)
১৩০। স্বপ্নের ঝাঁপি (১৯৮১)
১৩১। জবর দখল (১৯৮১)
১৩২। অফুরন্ত (১৯৮১)
১৩৩। জরিপ (১৯৮২)
১৩৪। সন্ধিক্ষণ (১৯৮২)
১৩৫। তুলির টানে আঁকা (১৯৮২)

১৩৬। যে যেখানে ছিল (১৯৮৩)
১৩৭। সূর্য্যাস্তের রং (১৯৮৩)
১৩৮। ঘর (১৯৮৩)
১৩৯। চাবি (১৯৮৪)
১৪০। আমি ও আপনারা (১৯৮৪)
১৪১। নাটকের শেষ দৃশ্যে (১৯৮৫)
১৪২। নির্ণয় (১৯৮৫)
১৪৩। খবর বলছি (১৯৮৫)
১৪৪। অস্তিত্ব (১৯৮৫)
১৪৫। উৎসমূল (১৯৮৫)
১৪৬। অচল পয়সা (১৯৮৫)
১৪৭। নীট ফল (১৯৮৫)
১৪৮। অভয়ারণ্য (১৯৮৬)
১৪৯। নিজস্ব রমণী (১৯৮৬)
১৫০। রমণীর মন (১৯৮৬)
১৫১। মান সম্ভ্রম (১৯৮৬)
১৫২। হঠাৎ একদিন (১৯৮৭)
১৫৩। নিলয় নিবাস (১৯৮৭)
১৫৪। সাদায় কালোয় নক্সা (১৯৮৭)
১৫৫। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড (১৯৮৭)
১৫৬। ছায়াতে আলোতে (১৯৮৭)
১৫৭। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে (১৯৮৮)
১৫৮। চিত্রকল্প (১৯৮৮)
১৫৯। পরমেশ্বরী (১৯৮৮)
১৬০। যার বদলে যা (১৯৮৯)
১৬১। এখানে ওখানে সেখানে (১৯৯০)
১৬২। সৃষ্টিছাড়া (১৯৯০)
১৬৩। লীলা চিরন্তর (১৯৯১)
১৬৪। কখনো কাছে কখনো দূরে (১৯৯১)
১৬৫। চাবিবন্ধ সিন্দুক (১৯৯২)
১৬৬। পথ জনহীন (১৯৯২)
১৬৭। নিমিত্ত মাত্র (১৯৯২)
১৬৮। সিঁড়ি ভাঙ্গা অংশ (১৯৯২)
১৬৯। নষ্ট কোষ্ঠী (১৯৯৩)
১৭০। ছোট সে তরী (১৯৯৩)
১৭১। দিব্য হাসিনীর দিনলিপি (১৯৯৪)
১৭২। ভি. আই. পির বাড়ীর লোক (১৯৯৪)
১৭৩। ভুল ট্রেনে উঠে (১৯৯৪)
১৭৪। তনুশ্রীর জগত (১৯৯৪)
১৭৫। একটি মিথ্যা ভাষী নায়ক (১৯৯৪)
১৭৬। শূন্যে সেতু (১৯৯৪)
১৭৭। স্থান কাল পাত্র (১৯৯৫)
১৭৮। যাচাই (১৯৯৫)
১৭৯। এঘর ওঘর (১৯৯৫)

উপন্যাসগুলো ছাড়াও উপন্যাসের কিছু সংকলন গ্রন্থও রয়েছে। কোথাও তিনটি, কোথাও চারটি, পাঁচটি বা ছয়টি করে উপন্যাস নিয়েও উপন্যাসের সংকলিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন — 'বর্ষা বসন্ত শরৎ' এই উপন্যাসের সংকলন গ্রন্থে তিনটি উপন্যাস রয়েছে। নীচে সংকলিত উপন্যাসের গ্রন্থগুলোর নাম দেওয়া হল —

১। একাল সেকাল অন্যকাল
২। সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত
৩। স্বপ্নমুখর রাত্রি
৪। নির্বাচিত উপন্যাস গুচ্ছ
৫। সকাল সন্ধ্যা রাত্রি
৬। তিনপ্রহর

৩৩। আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প সংকলন (১৯৯৩)
৩৪। নির্বাচিত ছোটগল্প (১৯৯৩)
৩৫। শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প (১৯৯৫)

আশাপূর্ণা দেবী ছোটদের রচনা দিয়েই নিজের সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন। এরপর সমস্ত ধরনের রচনার ফাঁকে তিনি ছোটদের জন্য আরো অনেক গল্প রচনা করেন। ছোটদের জন্য রচিত গল্পগ্রন্থগুলোর তালিকা —

১। ছোট ঠাকুর্দ্দার কাশীযাত্রা (১৯৩৮)
২। হাফ হলিডে (১৯৪১)
৩। রঙ্গিন মলাট (১৯৪১)
৪। ভাগ্যি যুদ্ধ বেঁধেছিল (১৯৪৬)
৫। বলবার মতন নয় (১৯৪৭)
৬। ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫৫)
৭। গল্প হলো শুরু (১৯৫৭)
৮। কনক দীপ (১৯৫৯)
৯। গল্প ভালো আবার বলো (১৯৫৮)
১০। রাজা নয় রাণী নয় (১৯৫৮)
১১। গল্পের মতো গল্প (১৯৫৮)
১২। কনক দীপ (১৯৫৯)
১৩। ছোটদের ভালো ভালো গল্প (১৯৬২)
১৪। এক সমুদ্র অনেক ঢেউ (১৯৬৩)
১৫। শোনো শোনো গল্প শোনো (১৯৬৫)
১৬। সেই সব গল্প (১৯৬৭)
১৭। হাসির গল্প (১৯৬৭)
১৮। কুমকুম (১৯৭০)
১৯। ডাকাতের কবলে আমি (১৯৭২)
২০। রাজকুমারের পোশাকে (১৯৭৫)
২১। রাজাই গল্প (১৯৭৬)
২২। দূরের বাঁশী (১৯৭৮)
২৩। দুজনে মিলে (১৯৭৯)
২৪। গজ উকিলের হত্যা রহস্য (১৯৭৯)
২৫। কিশোর সাহিত্য সম্ভার (১৯৮০)
২৬। ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৮১)
২৭। রহস্যের সন্ধান (১৯৮১)
২৮। ওনারা আসবেনই (১৯৮২)
২৯। ভূতুরে কুকুর (১৯৮২)
৩০। ছুটিতে ছুটোছুটি (১৯৮২)
৩১। পাখি থেকে হাতি (১৯৮৩)
৩২। সেরা রহস্য সম্ভার (১৯৮৪)
৩৩। কত কাণ্ড রেলগাড়িতে (১৯৮৫)
৩৪। জীবন কালীর পাক্কা হিসেব (১৯৮৫)
৩৫। কিশোর অমনিবাস (১৯৮৬)
৩৬। আশাপূর্ণা দেবীর সেরা বারো (১৯৮৮)
৩৭। এক কুড়ি গল্প (১৯৮৮)
৩৮। নিখর চায় আমোদ (১৯৯০)
৩৯। পাঁচ ভূতের গপ্পো (১৯৯০)
৪০। একের মধ্যে তিন (১৯৯১)
৪১। কপাল খুলে গেল নাকি (১৯৯২)
৪২। মাণিকচাঁদ ও চোদ্দসখী (১৯৯২)
৪৩। পয়লা দোসরা (১৯৯২)
৪৪। যুগলরত্ন টিকটিকি অফিস (১৯৯২)
৪৫। ষড়যন্ত্রের নায়ক (১৯৯২)
৪৬। ম্যাজিক মামা (১৯৯২)

৭। আশাপূর্ণা বীথিকা
৮। বর্ষা বসন্ত শরৎ
৯। তিন তরঙ্গ
১০। শেষ রায়
১১। চতুর্দ্দোলা
১২। চতুস্পর্ণা
১৩। পর্বত সখী
১৪। দশ দিগন্ত
১৫। উপন্যাস এক উপন্যাস
১৬। আবার ফিরে দেখা

আশাপূর্ণা দেবী প্রায় দেড় হাজারের মতে ছোটগল্প লিখেছেন। উপন্যাসের মত এক একটা গল্প পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়নি। নানা পত্র-পত্রিকায় তার বেশিরভাগটাই প্রকাশিত হয়েছে আর পরবর্তীকালে গল্পগ্রন্থ আকারে সেগুলো প্রকাশ পেয়েছে। স্ব-নির্বাচিত গল্প, স্ব-নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প যেমন লেখিকা নিজে নির্বাচন করেছেন। শ্রেষ্ঠ গল্পে যেমন বিখ্যাত গল্প, সরস গল্প ও শ্রেষ্ঠ হাসির গল্পে কৌতুক রসাশ্রিত গল্পগুলো সংকলিত হয়েছে। আবার যতটা সম্ভব কালানুক্রমিকভাবে 'মিত্র ও ঘোষ' থেকে 'গল্প সমগ্র' নামে ছয়টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। ছোটগল্প গ্রন্থের নামগুলো যথাসম্ভব নীচে দেওয়া হল —

১।	জল আর আগুন	(১৯৪০)	১৭।	সাজ বদল	(১৯৬২)
২।	সাগর শুকায়ে যায়	(১৯৪৭)	১৮।	আকাশ মাটি	(১৯৬৫)
৩।	শ্রেষ্ঠ গল্প	(১৯৪৭)	১৯।	কাঁচ পুঁতি হীরে	(১৯৬৭)
৪।	স্ব-নির্বাচিত গল্প	(১৯৫৫)	২০।	ভোরের মল্লিকা	(১৯৭৮)
৫।	আর একদিন	(১৯৫৫)	২১।	এক আকাশ অনেক তারা	(১৯৭৮)
৬।	সরস গল্প	(১৯৫৬)	২২।	বাছাই গল্প	(১৯৭৯)
৭।	পূর্ণ পাত্র	(১৯৫৬)	২৩।	নক্ষত্রের আকাশ	(১৯৮১)
৮।	স্বপ্ন - শর্বরী	(১৯৫৬)	২৪।	গল্পগুচ্ছ	(১৯৮৬)
৯।	গল্প পঞ্চাশৎ	(১৯৫৬)	২৫।	ঢেউ গুনছি সাগরের	(১৯৮৬)
১০।	পশ্চীমহল	(১৯৫৯)	২৬।	স্ব-নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প	(১৯৮৮)
১১।	নব নীড়	(১৯৬০)	২৭।	গল্প সমগ্র (১ম)	(১৯৯১)
১২।	কেশবতী কন্যা	(১৯৬১)	২৮।	গল্প সমগ্র (২য়)	(১৯৯২)
১৩।	মনোনয়ন	(১৯৬১)	২৯।	গল্প সমগ্র (৩য়)	(১৯৯৩)
১৪।	ছায়া সূর্য্য	(১৯৬১)	৩০।	গল্প সমগ্র (৪র্থ)	
১৫।	অতলান্তিক	(১৯৬২)	৩১।	গল্প সমগ্র (৫ম)	
১৬।	সোনালী সন্ধ্যা	(১৯৬২)	৩২।	গল্প সমগ্র (৬ষ্ঠ)	

৪৭। ব্যাপারটা কি হলো (১৯৯৩) ৪৯। অমরাবতীর অন্তরালে (১৯৯৪)

৪৮। রাণী মায়াবতীর অন্তর্ধান রহস্য (১৯৯৩) ৫০। সকাল (১৯৯৫)

আশাপূর্ণা দেবী শুধু যে বাংলা সাহিত্য জগতেই খ্যাতি অর্জন করেছেন তা নয়। তিনি ভারতীয় সাহিত্য ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করেছেন। একজন সাহিত্যিকের রচনায় যখন মানুষ নিজের অনুভূতিকেও খুঁজে পায় তখনই তা দেশোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ হয়। আশাপূর্ণা দেবীর অনেক রচনাই ভারতীয় সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে, তাই ভারতের নানা প্রাদেশিক ভাষায় তাঁর অনেক উপন্যাস, ছোটগল্প ও অন্যান্য রচনা অনুদিত হয়েছে। বিশেষত ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দিতে অনুবাদের সংখ্যা বেশি। এছাড়া ওড়িয়া, মালয়ালম, অসমীয়া, মারাঠী ও ইংরেজিতেও অনুদিত হয়েছে। বিশেষতঃ ত্রয়ী উপন্যাসের প্রথম পর্ব 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র অনুবাদের সংখ্যাই বেশি। আশাপূর্ণা দেবীর লেখা যে কত মানুষের ভালোবাসা দ্বারা সমাদৃত হয়েছে এবং পাঠক সমাজে তা কতটা ছাপ ফেলেছে অনুদিত গ্রন্থগুলোতে তার নিদর্শন মেলে।

গ্রন্থের নাম	অনুদিত গ্রন্থের নাম	প্রকাশ কাল
১। অগ্নি পরীক্ষা	অগ্নি পরীক্ষা (হিন্দি)	১৯৬৪
২। রাতের পাখি	রাত কা পনছি (হিন্দি)	১৯৬৮
৩। দোলনা	দোলনা (হিন্দি)	১৯৭২
৪। প্রথম প্রতিশ্রুতি	প্রথম প্রতিশ্রুতি (হিন্দি)	১৯৭২
৫। লঘু ত্রিপদী	টুটে সপনে (হিন্দি)	১৯৭৪
৬। সমুদ্র নীল আকাশ নীল	শ্রাবণী (হিন্দি)	১৯৭৬
৭। বালুচরী	তপস্যা (হিন্দি)	১৯৭৭
৮। সুবর্ণলতা	সুবর্ণলতা (হিন্দি)	১৯৭৮
৯। বকুলকথা	বকুলকথা (হিন্দি)	১৯৭৮
১০। বেতকা বৃন্দা	বনগুণ্ঠনবতী (হিন্দি)	১৯৮০
১১। তিনছন্দ	তিনছন্দ (হিন্দি)	১৯৮০
১২। দিনান্তের রং	জীবন সন্ধ্যা (হিন্দি)	১৯৮০
১৩। ভাঙা আয়না	টুটা শিশা (হিন্দি)	১৯৮১
১৪। আবহ সঙ্গীত	নেপথ্য সঙ্গীত (হিন্দি)	১৯৮২
১৫। সোনার কৌটা	মণিমঞ্জুষা (হিন্দি)	১৯৮২
১৬। মুখর রাত্রি	মুখর রাত্রি (হিন্দি)	১৯৮২

গ্রন্থের নাম	অনুদিত গ্রন্থের নাম	প্রকাশ কাল
১৭। প্রতীক্ষার বাগান	প্রতীক্ষার কানন (হিন্দি)	১৯৮২
১৮। সাগর কন্যা	সাগর তনয়া (হিন্দি)	১৯৮২
১৯। যখন আলোক নাহিরে	যব প্রকাশ হি না হো (হিন্দি)	১৯৮৩
২০। মিনুকে সেই তারা	ভোর কা না রে (হিন্দি)	১৯৮৩
২১। উড়ো পাখি	পন্‌ছি উড়া আকাশ (হিন্দি)	১৯৮৩
২২। সাপের ছোবল	সর্প দংশ (হিন্দি)	১৯৮৩
২৩। মনের সুখ	মন কা চেহেরা (হিন্দি)	১৯৮৪
২৪। বালির নীচে ঢেউ	অন্তঃ তরঙ্গ (হিন্দি)	১৯৮৪
২৫। অন্য মাটির অন্য রং	মাটিকা রং ঔর (হিন্দি)	১৯৮৫
২৬। সময়ের স্তর	সময় কা স্তর (হিন্দি)	১৯৮৫
২৭। নীটফল	অবশেষে (হিন্দি)	১৯৮৫
২৮। অতিক্রান্ত	অতিক্রান্ত (হিন্দি)	১৯৮৫
২৯। বলয়গ্রাস	বলয়গ্রাস (হিন্দি)	১৯৮৬
৩০। সন্ধিক্ষণ	সন্ধিক্ষণ (হিন্দি)	১৯৮৬
৩১। প্রেম ও প্রয়োজন	প্রেম ও প্রয়োজন (হিন্দি)	১৯৮৭
৩২। নিজস্ব রমনী	তশনী নারী (হিন্দি)	১৯৮৭
৩৩। খাঁচার পাখি ও পাখির খাঁচা	পিঞ্জরে কি চিড়িয়া (হিন্দি)	১৯৮৮
৩৪। প্রথম প্রতিশ্রুতি	প্রথম প্রতিশ্রুতি (অসমীয়া)	১৯৭৮
৩৫। প্রথম প্রতিশ্রুতি	প্রথম প্রতিশ্রুতি (ওড়িয়া)	
৩৬। প্রথম প্রতিশ্রুতি	প্রথম প্রতিশ্রুতি (মারাঠি)	
৩৭। প্রথম প্রতিশ্রুতি	প্রথম প্রতিশ্রুতি (মালয়ালম)	১৯৮৫
৩৮। যখন আলোক নাহিরে	প্রকাশম ইল্লাগযাপ্পল (মালয়ালম)	১৯৮৫
৩৯। সুবর্ণলতা	সুবর্ণলতা (মালয়ালম)	১৯৮৬
৪০। বিলম্বিত	বিলম্বিত (ওড়িয়া)	১৯৮২
৪১। সাপের ছোবল ও দূরের জানালা	Snake dite (ইংরেজি) The Distainet Window	১৯৮৩
৪২। সমুদ্র নীল আকাশ নীল	সমুদ্র নীল আকাশ নীল (ওড়িয়া)	১৯৮৮
৪৩। গুণ্ঠনবতী	মানালকাট্রিল ভ্রুন্ডাভাণম (মালয়ালম)	১৯৮৮

গ্রন্থের নাম	অনুদিত গ্রন্থের নাম	প্রকাশ কাল
৪৪। এই তো সেদিন	অভি তো উসদিন (হিন্দি)	১৯৮৯
৪৫। অস্তিত্ব	অস্তিত্ব (হিন্দি)	১৯৮৯
৪৬। নিলয় নিবাস	নিলয় নিবাস (হিন্দি)	১৯৮৯
৪৭। হঠাৎ একদিন	অচানক একদিন (মালয়ালম)	১৯৮৯
৪৮। বকুল কথা	বকুলিন্তে কথা (মালয়ালম)	১৯৮৯
৪৯। ছোটগল্প সংকলন	কিচিয়া (হিন্দি)	১৯৯০
৫০। যার বদলে যা	প্রারব্ধ (হিন্দি)	১৯৯০
৫১। রমণীর মন	নারীমন (হিন্দি)	১৯৯১
৫২। রমণীর মন	দাসী পুত্র (হিন্দি)	১৯৯১
৫৩। রমণীর মন	নাগলতা (হিন্দি)	১৯৯১
৫৪। লেখা জোখা	জরিপ (হিন্দি)	১৯৯২
৫৫। আবহ সঙ্গীত	অনিয়ারা সঙ্গীতম (মালয়ালম)	১৯৯২
৫৬। দূরের জানালা	দূর কী খিড়কী (হিন্দি)	১৯৯৩
৫৭। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর	দৃশ্য সে দৃশ্যান্তর (হিন্দি)	১৯৯৩
৫৮। দিকচিহ্ন	দিক্‌চিহ্ন (দশদিগন্ত) (হিন্দি)	১৯৯৪
৫৯। কখনো দিন কখনো রাত	কভী দিন কভী রাত (হিন্দি)	১৯৯৪
৬০। ভুল ট্রেনে উঠে তনুশ্রীর জগৎ এমনও হতে পারে	অক্ষমৎ অপরাধ (হিন্দি)	১৯৯৪
৬১। শেষ রায়	অন্তিম ফয়সালা (হিন্দি)	১৯৯৪
৬২। কাঁচ পুতি হীরে (ছোট গল্প সংকলন)	কাঁচ পুতি হীরে (হিন্দি)	১৯৮৭
৬৩। ছোটগল্প সংকলন শ্রেষ্ঠগল্প ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড	(ওড়িয়া)	
৬৪। ছোটগল্প সংকলন	A Bonquet of Modern Short Stories (ইংরেজি)	১৯৭৮

তাঁর অনেক উপন্যাস ও কিছু ছোট গল্প বাংলা ও হিন্দি ভাষায় চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। শুধু

পাঠক সমাজেই নয়, চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি আপামর জনসাধারণের অন্তরেও ঠাঁই করে নিয়েছেন।

১। যোগবিয়োগ	৬। শশীবাবুর সংসার	১১। চেনা অচেনা (সুয়োরাণীর সাধ)
২। অগ্নিপরীক্ষা	৭। ছায়াসূর্য	১২। অনিন্দিতা
৩। কল্যাণী	৮। দোলনা	১৩। নায়িকার ভূমিকায় (মায়াজাল)
৪। বলয়গ্রাস	৯। তাহলে	১৪। প্রথম প্রতিশ্রুতি
৫। নবজন্ম	১০। বালুচরী	১৫। সুবর্ণলতা
		১৬। উত্তরলিপি

হিন্দি ছায়াছবি হয়েছে যেগুলো ঃ-

১। মেহেরবান (যোগবিয়োগ)	৩। চৈতালী (উত্তরণ)
২। ছোটি সি মুলাকাৎ (অগ্নিপরীক্ষা)	৪। তপস্যা (বালুচরী)

এছাড়াও কিশোরদের জন্য রচিত গ্রন্থাবলী তিনটি খণ্ডরূপে প্রকাশ পেয়েছে। আশাপূর্ণা দেবীর সমগ্র রচিত উপন্যাস, অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ও কবিতা নিয়ে দশখানি রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। 'আর এক আশাপূর্ণা' নামে ১৯৯৫ সালে প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয়।

আশাপূর্ণা দেবীর রচিত প্রায় ১৭৯ খানি উপন্যাস, ৩২টি ছোটগল্প সংকলন, ছোটদের জন্য বই ৪৯টি ও ১৬টি উপন্যাসের সংকলিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে ত্রয়ী উপন্যাস (প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা ও বকুলকথা)। চিত্রায়িত ও মঞ্চে অভিনীত উপন্যাস ও গল্প হল — প্রায় ১৬টি উপন্যাস চিত্রায়িত, বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রায় তিরিশটির কাছাকাছি গল্প ও উপন্যাস চিত্রায়িত। উপন্যাস অবলম্বনে অন্ততঃ ৭টি নাটক রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছে। রেডিওতে নানাগল্প ও উপন্যাসের অসংখ্য নাট্যরূপ অভিনীত হয়েছে। দূরদর্শনেও ধারাবাহিকভাবে অনেক গল্প উপন্যাস চিত্রায়িত হয়েছে।

অনুদিত হয়েছে হিন্দিতে ৪৯ খানা উপন্যাস, অসমীয়া ভাষায় ১ খানি, ওড়িয়া ভাষায় ৪খানি, মালয়ালম ভাষায় ৫টি, মারাঠিতে ১টি ও ইংরেজিতে এখনও পর্যন্ত ২ খানি গ্রন্থ।

আশাপূর্ণা দেবী শুধু মাতৃভাষাতেই পড়াশোনা করতেন, কারণ প্রথাগত শিক্ষা মেনে তিনি বিদ্যালয় শিক্ষালাভ করেননি। তাই বিদেশী সাহিত্যগুলোর অনুবাদ গ্রন্থই তিনি পাঠ করেছিলেন। পড়তে পড়তে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তাকেই তিনি তাঁর রচনায় মূল উপজীব্য করেছিলেন। তাঁর উপলব্ধিতে ধরা পড়েছিল যে, পরিবেশ-দেশ-কাল ও পাত্র-পাত্রী যাই হোক না কেন ভেতরে সমস্ত মানুষই এক।